ভে ত রে

... মোদী রসায়নকে প্রতিরোধ করুন ... ২
ভাঙ্গছে স্থিতাবস্থা ... ৩
আজকের বিহার ... ৪
হিন্দুত্ব, সঙ্ঘ পরিবার ও কিছু কথা ... ৬
... বাইশ বছর আগের এক দিনকে ঘিরে ... ৭

আজকের দেশব্রতী

₹৩

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১৫০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৮০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ৪০ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ১১ ডিসেম্বর ২০১৪

৬ ডিসেম্বর কলকাতায় ১৭টি বামদলের

সুবিশাল সম্প্রীতি মিছিল

৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার কালো দিনে কলকাতার রাজপথ জুড়ে মিছিলে শ্লোগানে উত্তাল জনস্রোত গর্জে উঠল ''বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারীদের বিচার চাই শাস্তি চাই''। গণজোয়ারের ঐ সুদীর্ঘ মিছিল জানান দিল, সাম্প্রদায়িক কর্পোরেট ফ্যাসিবাদী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বাম প্রতিরোধের শক্তিগুলো আজ জোট বাঁধছে, তৈরী হচ্ছে। মিছিলে প্রধানত বৃহত্তর কলকাতার মেহনতী মধ্যবিত্ত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, নবীন প্রজন্মের বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি—দৃপ্ত মনোভাব দেখিয়ে দিল বাম শক্তি পারে প্রতিক্রিয়াকে রুখে দিতে। বর্তমান রাজ্য রাজনৈতিক পরিস্থিতির নতুন বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতি রেখে সংগ্রামী সমন্বয়ের ভিত্তিতে গঠিত ১৭টি বামদলের আহ্বানে মিছিল শপথের বার্তা তুলে ধরলো—জীবন-জীবিকার উপর কেন্দ্রের ও রাজ্যের শাসকদের হামলার মোকাবিলা করে শ্রেণী আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই সাম্প্রদায়িক বিভেদের ঢেউ রুখতে হবে। মিছিলে শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, মহিলা, ছাত্র-যুব এমনকি বয়ঃজ্যেষ্ঠরা প্রায় ৬ কিলোমিটার পথ হেঁটেছেন, কষ্ট-ক্লান্তি উপেক্ষা করেছেন, আজকের সময় উপযোগীরূপে মূর্ত করে তুলেছেন বাংলার বাম আন্দোলনের ঐতিহ্যকে। যেখানে বিভেদ-বিভাজনের কোন স্থান নেই, সংগ্রামী শ্রেণী ঐক্যই একমাত্র এগিয়ে চলার পাথেয়। প্রায় অর্ধ লক্ষ মানুষের জমায়েত দেখে মিডিয়া নির্বাচনী সমীকরণ খুঁজতে ব্যস্ত হলেও, স্রোতের বিপরীতে হেঁটে বিপ্লবী বামপন্থীরা নীচুতলায় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। মিছিলে ছাত্র-যুবদের একটি দলকে দেখা গেল সকলেই কালো টি-শার্ট পরে এসেছে, সেখানে লেখা আছে—''ধর্ম যার যার, দেশটা সবার''। মিছিলে সুসজ্জিত ট্যাবলোতে শ্লোগান লেখা ছিল—বিজেপি-আর এস এস প্ররোচনামূলক প্রচার বন্ধ কর, মৌলবাদী শক্তির তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রশাসন নীরব কেন? গণতন্ত্র ধ্বংস করে সাম্প্রদায়িকতা রোখা যায় না, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধ-বিভেদের রাজনীতি ধ্বংস হোক, সংখ্যালঘু অংশের মানুষকে অকারণে হয়রানি হেনস্থা করা চলবে না ইত্যাদি। লালনের সম্প্রীতির গান গাইতে গাইতে বাউল সম্প্রদায়ের একটি টিম মিছিলকে প্রাণবন্ত করে তুলছিল। গণসাংস্কৃতিক কর্মীরা ''আয়রে পরান ভাই, আয়রে রহিম ভাই কালো নদী কে হবি পার'' সলিল চৌধুরীর সেই চিরকালীন গানে, ''হাতে হাত রেখে বিষের বিষাদ সিন্ধু পার হওয়ার'' গণসঙ্গীতে সৃষ্টি করছিলেন উদ্দীপ্ত আবহ। কলেজ স্ট্রীট সংলগ্ন বৌবাজার ক্রসিং-এ ছাত্র সংগঠন আইসার একটি দল উদ্দীপনাময় শ্লোগান দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে মিছিলের সপক্ষে প্রচার চালায়। কর্পোরেটদের স্বার্থবাহী নীতিগুলোকে চাপিয়ে দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তার বিরুদ্ধে মিছিল গর্জে উঠেছে, পাশাপাশি এই রাজ্যে তৃণমূল সরকারের গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। পথচলতি হাজার হাজার মানুষ এই লাল লহর দেখে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থেকেছেন, সমর্থন জানিয়েছেন। অবশেষে মিছিল যখন রবীন্দ্র সদনে পৌঁছাল তখন শেষপ্রান্ত ধর্মতলা পেরোতে পারেনি।

রবীন্দ্র সদন চত্বরের মঞ্চে ১৭ দলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। শুরুতে সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু বলেন, আজ থেকে ২২ বছর আগে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ, সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক শক্তি। ওরাই আজ দিল্লীর চার্চে আগুন লাগিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক, কয়লা, রেলের কর্মচারীরা ধর্মঘটে নামছেন আর সাম্প্রদায়িক শক্তি চাইছে শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষের লড়াইকে ধ্বংস করতে। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস নিয়ে একটাও কথা বলেনি কংগ্রেস। কোন ব্যবস্থাও নেয়নি। এ রাজ্যে গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরার চেষ্টা চলছে। মিথ্যা অজুহাতে মামলায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

এ আই সি সি টি ইউ সমাবেশের বার্তা

সামনে দিন, জোর লড়াই—জোট বাঁধো, তৈরী হও!

এ আই সি সি টি ইউ-র নেতৃত্বে গত কয়েকমাস যাবত সংগঠিত ও অসংগঠিত শিল্পগুলোতে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষের বেশ কিছু জ্বলন্ত দাবিকে সামনে রেখে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। এই অভিযানের পর গত ৮ ডিসেম্বর কলকাতার রাণী রাসমণি রোডে আয়োজিত এক শ্রমিক সমাবেশে সামিল হন নির্মাণ শ্রমিক, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, মিড-ডে-মিল প্রকল্পের রন্ধনকর্মী, পরিচারিকা, আশাকর্মী, বিড়ি শ্রমিক, পরিবহন শিল্পে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারী, হোসিয়ারি শিল্পের শ্রমিক ও চটকল মজদুরদের ইউনিয়নগুলো ছাড়াও সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, লালপতাকা শোভিত ও শ্লোগান মুখরিত এই সমাবেশে বন্ধ কারখানা খোলা ও রুগ্ন শিল্পের পুনরুজ্জীবন, চটকল ও চা শিল্পে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে, চটশিল্পে বাধ্যতামূলক প্যাকেজিংয়ের পরিমাণ হ্রাস করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মানুষ মারা শ্রমনীতির বিরুদ্ধে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার দাবিগুলোকে সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে ছিনিয়ে আনা; চা বাগানে মৃত্যুর মিছিল বন্ধ করা এবং পরিবহন শিল্পে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের নয়া অর্থনীতির কামানের খোরাক বানানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও লাগাতার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সভা শুরুর অনেক আগেই রাণী রাসমনি রোডে প্রথম লেনটি পূর্ণ হয়ে যায় এবং হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন থেকে আসা আরও দুটি বড় মিছিল অংশগ্রহণকারীদের স্থান হয় দ্বিতীয় লেনে। সমাবেশে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল ব্যাপক সংখ্যায় মহিলা শ্রমিকরা—যারা ছিলেন অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রান্তিক মানুষদের প্রতিনিধি এবং যারা লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে ও পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে সমমর্যাদা ও সমমজুরির দাবিতে সোচ্চারে সংগঠিত হচ্ছেন।

সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, এ আই সি সি টি ইউ-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্য সভাপতি যথাক্রমে বাসুদেব বসু ও অতনু চক্রবর্তী সহ রাজ্য কমিটির সদস্য নবেন্দু দাশগুপ্ত, দিবাকর ভট্টাচার্য, মীনা পাল, ওমপ্রকাশ রাজভর, কিশোর সরকার প্রমুখ।

সভার পরিচালক অতনু চক্রবর্তী প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেন, কর্পোরেট পুঁজির ভয়াবহ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলেন শ্রমিকরা। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত কয়েক বছরে এরাজ্যে ১০০ শতাংশ শ্রম দিবসই নষ্ট হয়েছে মালিক শ্রেণীর কারখানা বন্ধের কারণে, শ্রমিক আন্দোলনের কারণে নয়। চা বাগানে ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হয় মাত্র ৯৫ টাকা প্রতিদিন, দাবি ন্যূনতম ২৩৯ টাকা মজুরির। মালিকপক্ষ, সরকার ও ইউনিয়নগুলোর ত্রিপাক্ষিক চুক্তি এখনও অধরা—চলছে আত্মহত্যা, মৃত্যু মিছিল। বাধ্যতামূলক চটের প্যাকেজিং ৩০ শতাংশ কমিয়ে দিতে চাইছে সরকার। এসব করা হচ্ছে সিনথেটিক ফাইবার প্রস্তুত কারক কর্পেরেট লবির চাপে। ফলে পাটি শিল্পে কোন শ্রমিকেরই সপ্তাহে ৪-৫ দিনের বেশী কাজ মিলছে না, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন পাটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ। প্রতিবাদে গত ২৬ নভেম্বর পাট শিল্পের সফল ধর্মঘট ও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুর দুয়ারে চা-শ্রমিকদের ৪৮ ঘন্টার ধর্মঘট ও শিলিগুড়ি সহ জলপাইগুড়ি জেলায় সাধারণ ধর্মঘট প্রত্যক্ষ করলাম আমরা। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কলকাতায় বিশাল জমায়েত ও অসংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের বেশ কিছু সফল লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জন্ম নিচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

বাসুদেব বসু উত্তরবঙ্গে পুঁজির নির্মম আক্রমণের শিকার চা শিল্পের লড়াকু শ্রমিকদের নাছোড় লড়াই ও ধর্মঘটের বীরত্বপূর্ণ কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ রাজ্যে পরিবহন শিল্পে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা চা শ্রমিকদের মতই আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন। সরকারি কর্মীদের ডি এ নেই। নির্মাণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো সহ গোটা দেশটাকেই বিক্রী করে দিতে উদ্যত।

সাতের পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

আরেক ফতোয়া

মমতা সরকারের আরেক ফতোয়া জারি হল খোদ 'নবান্ন'-র ভেতরে সংবাদ-কর্মীদের গতিবিধির ওপর। পত্রিকা বা বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমের কর্মীদের খবরের সন্ধানে নবান্ন ভবনের এখানে সেখানে আর ঘোরাফেরা করা যাবে না। তাদের গণ্ডীবদ্ধ থাকতে হবে প্রশাসন নির্দেশিত নির্দিষ্ট প্রেস কর্ণারেই। তা না মানলে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হতে পারে। হুমকি দিয়ে রাখা হয়েছে এতটাই। ব্যতিক্রম কোন আবেদন থাকলে সুপারিশ জোগার করতে হবে পুলিশ-প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের থেকে, তা যদিও বা বিবেচনাবশত মেলে তবুও গতিবিধিতে লেপ্টে থাকবে পুলিশের লোক। এই ফতোয়া শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে কোনও 'স্বনামধন্য' মন্ত্রী মারফৎ নয়। এই সিদ্ধান্ত যে মন্ত্রীসভার সর্বোচ্চ ক্ষমতাবানের মস্তিষ্ক প্রসূত তাতে কোনও সন্দেহ নেই, তৃণমূল দল ও সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার কালচার ইতিমধ্যেই বহুল পরিচিত, সমস্ত গুরুতর চিন্তার ও ফরমান তৈরী হওয়ার উৎস একচেটিয়া একটিই, আর তা হল দলনেত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর মানস সরোবর। কিন্তু তাঁরও নবান্নে নয়া নির্দেশটি কোনও মন্ত্রীমশাইকে দিয়ে জারি করানোর স্পর্ধা হয়নি। স্রেফ ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষকে দিয়েই হুলিয়াটা শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন হল, 'নবান্ন'-র ভেতরে গণতন্ত্রের স্বীকৃত চতুর্থ স্তম্ভের ওপর স্বঘোষিত 'মা-মাটি-মানুষের' সরকারকে এক জরুরী অবস্থা জারি করতে হল কেন? যে নেত্রীর শাসনক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত, এমনকি ক্ষমতায় আসার পরেও অন্ততঃ কিছুদিন পর্যন্ত, যতদিন না নানা ঘটনাবলীর আবর্তে রাজ্য সরকারের অগণতান্ত্রিক ভূমিকা সমাজে ও সংবাদমাধ্যমে ধরা পড়তে শুরু করেছে, তার আগে অবধি সংবাদকর্মীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক ছিল, ছিল রাখীবন্ধনের মিতালী, নেত্রী সেই সম্পর্ককে পরিণত করেছেন আদায়-কাঁচকলায়। একতরফা নিজ গুণ-গান শোনাচ্ছেন, গাল পাড়ছেন, গাত্রদাহে ভুগছেন, গাজোয়ারি দেখাচ্ছেন। ক্ষেপে যাওয়ার মূল কারণ হল, সরকারের কথায় ও কাজের মধ্যে স্ববিরোধ ধরা পড়ছে, দ্বিচারিতা লক্ষ্যণীয় ভাবে চিহ্নিত হচ্ছে, বিশেষত মা-মাটি-মানুষের পাশ থেকে সরে যাওয়ার তথ্যগুলো নিত্যদিন খবর হয়ে যাচ্ছে। সংবাদ দর্পণে এসব চর্চার বিষয় হয়ে ওঠার মধ্যে যেমন সংবাদমালিকের বাজারের স্বার্থ রয়েছে, তেমনি সমাজের প্রতিক্রিয়ারও প্রতিফলন থাকে। এখন কোনও শাসকই এহেন সমালোচনা বা বিরূপতা বরদাস্ত করতে চায় না। চেষ্টা করে বশ মানাতে, না পারলে নেয় চণ্ডনীতি। মমতা সরকার সেটাই শুরু করেছে। সংবাদমাধ্যম ও সংবাদকর্মী ততক্ষণ ভালো যতক্ষণ সে আমার। তা না হলে সবক শেখাতে শেকল পরানো হবে।

ক্ষমতায় আসার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা প্রথমে সংবাদপত্রের পঠন-পাঠনের স্বাধিকারের ওপর মাস্টারি করতে শুরু করেন। কোন্ কোন্ সংবাদপত্র পড়বেন আর পড়বেন না তা নিয়ে ছড়ি ঘোরানো শুরু করেন। সরকারি বা সরকার অনুদান নির্ভর সংস্থায় কিছু পত্রিকা বর্জন আর কিছু পত্রিকার অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্তের সপক্ষে সওয়াল করেন। ঢঙটা নেওয়া হয়েছিল 'মাটির মানুষের'। বাজারে প্রতিষ্ঠিত কুবেরদের পত্রিকাগুলোকে বাদ দিয়ে কমজোরী প্রান্তিক পত্রিকাগুলোকে তুলে ধরার যুক্তি-তর্ক-গপ্পো শোনানো হয়েছিল। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংগ্রাম ও সমালোচনার অধিকার, ন্যায়বিচারের দাবি আর যাবতীয় গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকারের ওপর আক্রমণের পুনরাবৃত্তি ঘটতে শুরু করল। তারপর সারদার প্রতারণা আর তার সাথে জড়িয়ে যাওয়া তৃণমূলের কেলেঙ্কারির গরল বের হওয়া শুরু হয়ে গেল। এখনও বের হচ্ছে। এরই মধ্যে জানা গেল মুখ্যমন্ত্রীর তুলে ধরা একটি পত্রিকাকে, যার কোন বাজারদাম ছিল না, অথচ বেশ কয়েক কোটি টাকায় সারদা মালিককে কিনতে বাধ্য করা হয়েছিল তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের চাপেই। তৃণমূলের প্রচারের হাতিয়ার বানানোর উদ্দেশ্যেই। যা জানা গেছে তা উন্মোচিত খণ্ডতথ্য মাত্র। তৃণমূল দল আর সরকার সংবাদকর্মীদের দুভাবে শায়েস্তা করার পলিসি নিয়েছে। দল যেখানে মনে করলেই শারীরিক আক্রমণ করছে, সরকার সেখানে শুরু করেছে নিয়ন্ত্রণের নামে বেড়ী পরানো।

এই পলিসি, এই আচরণ অবশ্যই জঘন্য। তীব্র ধিক্কার জানানোর। পাল্টা উচিত শিক্ষা দেওয়ার।

'নবান্ন'-তে কর্মরত সংবাদকর্মীরা তাদের ওপর চাপানো জরুরী অবস্থার ফতোয়া প্রত্যাহারের দাবিতে মুখর হয়েছেন। তাঁরা ঠুসে ধরছেন। মন্ত্রীমশাইরা একতরফা নিজেদের জাহির করে পাশ কাটাতে চাইছেন, ভয় পাচ্ছেন প্রশ্নোত্তরের মুখোমুখি হতে, ভয় পাচ্ছেন অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতার অধিকারকে স্বীকার করতে। পাল্টা চ্যালেঞ্জ বুঝিয়ে দিতে 'নবান্ন'-র সংবাদকর্মীরা নিয়েছেন সরকারি সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করে চলার পদক্ষেপ। খুবই ন্যায়সঙ্গত পদক্ষেপ।

... সুবিশাল সম্প্রীতি মিছিল

একের পাতার পর

মহিলাদের নিগ্রহকারি তৃণমূলীদের কোন শাস্তি হচ্ছে না। দ্বিতীয় বক্তা সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ বলেন, আজকের এই মিছিল ধর্মনিরপেক্ষতার ও সম্প্রীতির মিছিল। তৃণমূল কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষতার নাটক করছে, গণতন্ত্র হত্যা করে ধর্মনিরপেক্ষতার লড়াই করা যায় না। তাই বাম শক্তিকেই এগিয়ে যেতে হবে। কংগ্রেস দলের জনবিরোধী ভূমিকার কারণে কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার লড়াই করা সম্ভব নয়। যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছে, গুজরাটে মুজফফরনগরে দাঙ্গা করে মানুষ খুন করেছে তারা আজ অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ রাজ্যে বামপন্থার ঐতিহ্য আছে, বামপন্থার সংগ্রাম আছে। সি পি আই নেতা মঞ্জু মজুমদার বলেন, বর্তমানে নরেন্দ্র মোদী সরকার হিন্দু রাষ্ট্র করার কথা বলছে। কিন্তু ওরা সেটা পারবে না। আর এস পি-র মনোজ ভট্টাচার্য বলেন, শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এই সরকার। শ্রমজীবী মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে না পারে তার জন্য দাঙ্গা বাঁধানো হচ্ছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের বরুণ মুখার্জী বলেন, আমাদের লড়াই ত্রিমুখী—কংগ্রেস, বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এস ইউ সি আই (সি) দলের দেবপ্রসাদ সরকার বলেন, মধ্যযুগীয় বর্বরতায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ওরা এ কাজ করেছিল। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্যোসালিস্ট পার্টির জন্মেঞ্জয় ওঝা, ডি এস পি-র প্রবোধ সিনহা, পি ডি এসের সুভাষ বসু, সি আর এল আই-এর অসীম চ্যাটার্জী।

- জয়তু দেশমুখ

"আজকের দেশব্রতী" সম্পাদকমণ্ডলী
অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী,
জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত,
সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

কর্পোরেট লুণ্ঠন এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মোদী রসায়নকে প্রতিরোধ করুন

''যে সরকার দরিদ্রদের যত্ন নেবে, সে সরকার দরিদ্রদের জন্যই বাঁচবে''—সংসদের কেন্দ্রীয় কক্ষে তাঁর দলের নবনির্বাচিত সাংসদদের সামনে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় নরেন্দ্র মোদী এভাবেই বর্ণনা করেছিলেন তাঁর হতে চলা সরকারকে। এই কথাটা তিনি বলেছিলেন ২০১৪ সালের ২০ মে, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার ঠিক ছ-দিন আগে। এর ছ-মাস পর নরেন্দ্র মোদী যখন আরও একটা দীর্ঘ বিদেশ ভ্রমণ সেরে ভারতে ফিরলেন, নতুন সরকার তখন আজ পর্যন্ত গঠিত সমস্ত সরকারের মধ্যে খোলাখুলিভাবে সবচেয়ে বেশি কর্পোরেট-চালিত সরকার রূপে প্রশ্নাতীতভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যে সরকার বৃহৎ ব্যবসার স্বার্থে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছে, যে সরকারের অস্তিত্ব শুধু আদানি-আম্বানি ও তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্যই।

কথায় বলে, হাজারটা কথা যা প্রকাশ করতে পারে না একটা ছবি তা করে দেয়। গত ছ-মাসে মোদীর যে সহস্রাধিক ছবি আমরা দেখেছি তার মধ্যে দুটো ছবি তাঁর সরকার সম্পর্কে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা দেয়, ঝাঁটা হাতে মোদী এবং বিজেপির অন্যান্য মন্ত্রী ও নেতৃবৃন্দকে বিজ্ঞাপিত করা অসংখ্য ছবির চেয়ে অনেক ভালভাবেই ঐ ছবিদুটো তা করে। প্রথম ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে ২৬ মে শপথ নিতে আহমেদাবাদ থেকে দিল্লী যাওয়ার জন্য মোদী আদানির নিজস্ব একটা জেট বিমানে চাপছেন। আর কোটিকে গুটিক ছবির মত দ্বিতীয় ছবিটা তোলা হয় মোদী যখন আম্বানির তৈরি সর্বশেষ হাসপাতালটি উদ্বোধনের জন্য মুম্বই যান এবং ঐ ছবিতে মুকেশ আম্বানিকে মোদীর পিঠ চাপড়াতে দেখা যাচ্ছে। ইউ পি এ-র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পেটোয়া পুঁজিবাদকে জানার জন্য রাডিয়া টেপের দরকার হয়েছিল, মোদী কিন্তু কোনরকম রাখঢাক না করেই আদানি ও আম্বানির সঙ্গে তাঁর সখ্যতাকে প্রকট করছেন।

ভারতের হাজার-হাজার কোটি টাকার মালিকদের মধ্যে দশম ধনী হিসাবে গৌতম আদানির উত্থান এবং নরেন্দ্র মোদীর বৃহত্তর আখ্যান একাকার হয়ে রয়েছে। আদানির আর্থিক তাকত ২০০২-এর ৭৬.৫ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ২০১৩-তে দাঁড়ায় ৮০৮.৮০ কোটি ডলার। আদানি ২০০৯-এর বিপর্যয়কর ভূমিকম্পের পর কচ্ছ অঞ্চলকে কার্যত গ্রাস করে নেন এবং ভূমিকম্পের পর কচ্ছকে পুনরায় গড়ে তোলার জন্য যে ছাড় এবং আর্থিক সুবিধা মঞ্জুর করা হয় তাকে কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এখন কেন্দ্রীয় সরকার আবার তাঁর সেবায় সক্রিয় ঃ গুজরাট হাইকোর্ট আদানির বিপুলাকায় যে সেজকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে আর অস্ট্রেলিয়ায় আদানির কয়লা উদ্যোগের জন্য এস বি আই ১ বিলিয়ন ডলার (৬০০০ কোটি টাকা) ঋণ মঞ্জুর করেছে। উল্লেখ্যযে ৩১ মার্চ ২০১৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪-এর মধ্যে আদানি গোষ্ঠীর ব্যাঙ্ক ঋণ ৭৬৫৩.৩৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে বিপুল পরিমাণ ৭২৬৩২.৩৭ কোটি টাকায়।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে মোদী সরকার সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছে যে, সে তার কর্পোরেটপন্থী প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগপন্থী এজেণ্ডাকে বেপরোয়াভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কুখ্যাত কয়লা অর্ডিন্যান্স ইতিমধ্যেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খননের জন্য কয়লা ক্ষেত্রকে বেসরকারি উদ্যোগের কাছে খুলে দিয়েছে, ও এন জি সি-র শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ডিজেলের মূল্যের বিনিয়ন্ত্রণ ঘটানো হয়েছে এবং গ্যাসের মূল্যের পুনর্বিন্যাস ঘটানো হয়েছে যার ফলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গ্যাসের দাম এক-তৃতীয়াংশ বেড়ে যাবে। প্রতিরক্ষা, বীমা এবং রেলের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোকে ব্যাপক আকারে বিদেশী বিনিয়োগের কাছে খুলে দেওয়া হচ্ছে এবং ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকেও এমনভাবে নখদন্তহীন করে তোলা হয়েছে যাতে করে বিদেশী বড় বড় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলো ভারতের বাজার থেকে বিপুল মুনাফা করতে পারে। ভারতের মেধাস্বত্ব আইনগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারির অধীন করে তোলা হচ্ছে এবং ভারতে পেটেন্টের সঙ্গে যুক্ত কর্তাব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগকে খোলাখুলিভাবে প্রভাবিত করার অনুমতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ প্রস্তুতকারক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিদের দেওয়া হচ্ছে।

এর সাথে কল্যাণমূলক আইনগুলোকে লঘু করে তোলার চলমান ধারাকে যুক্ত করুন এবং নতুন সরকারের অর্থনৈতিক এজেণ্ডা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রম আইনগুলোকে এমনভাবে সংশোধন করা হচ্ছে যাতে করে কারখানা আইন মানা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সমস্ত ধরণের নজরদারি থেকে কোম্পানিগুলো মুক্ত হতে এবং ইচ্ছেমতো নিয়োগ ও ছাঁটাই করতে পারে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনকে বাছাই করা কয়েকটি জেলায় সীমিত করার চেষ্টা হচ্ছে এবং ঐ আইনের অবনতি ঘটিয়ে তাকে বর্তমানের কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন থেকে পর্যবসিত করা হচ্ছে একটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পে যা বিদ্যমান সরকারের খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল হবে। জমি অধিগ্রহণ আইনকেও এমনভাবে সংশোধনের চেষ্টা হচ্ছে যাতে জমি হারানো কৃষকদের সম্মতি ও ক্ষতিপূরণের ধারা লঘু হয়ে উঠবে এবং যে সমস্ত ভূমিহীন মানুষ জীবিকা হারাবেন তাদেরও ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের আওতার বাইরে রাখা যাবে। খাদ্য নিরাপত্তা আইন নিয়ে অন্তহীন টালবাহানা চলছে, যদিও সম্প্রতি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বালি পর্বের বৈঠকে ভারত-মার্কিন বোঝাপড়ার সাথে সাথে খাদ্যে ভর্তুকির ইস্যুতে ধনী দেশগুলোর চাপের কাছে নতিস্বীকারের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। দরিদ্র-বিরোধী এই অর্থনৈতিক আগ্রাসনের সাথেই নতুন সরকার দেশের শিক্ষা ও গবেষণা এবং তথ্য ও সম্প্রচার ব্যবস্থার উপর আর এস এস-এর নিয়ন্ত্রণকে গভীরতর করে তোলার নিরবচ্ছিন্ন অভিযান চালাচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার ছ-মাস পর কর্পোরেট লুণ্ঠন এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের এই বিপর্যয়কর মোদী রসায়নের মুখোমুখি আমাদের হতে হচ্ছে। নতুন সরকার সম্পদের কেন্দ্রীভবন, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং সমাজের সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রক্রিয়াকে জোরদার করে তুলেছে। ভারতীয় জনগণের লড়াকু বাহিনীকে তাদের সামগ্রিক শক্তি দিয়ে এই ভয়ানক চক্রান্তকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ও পরাস্ত করতে হবে।

(লিবারেশন সম্পাদকীয়, ডিসেম্বর ২০১৪)

''আজকের দেশব্রতী''
পড়ুন—গ্রাহক হোন

ভাঙ্গছে স্থিতাবস্থা বাড়ছে নতুন অস্থিরতা

পশ্চিমবাংলায় এখন ক্ষমতার রাজনীতির পালোয়ানীতে মত্ত একদিকে টি এম সি অন্যদিকে বিজেপি। দীর্ঘ বাম প্রাধান্যের ঐতিহ্যের রাজ্যে এখন দক্ষিণপন্থার দুটি শক্তি প্রাধান্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরস্পরকে টেক্কা দিতে মরীয়া। প্রকৃত অর্থে বললে, চলছে তাই রাজ্যে এবং কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা শাসকশ্রেণীর দুটো দলের মধ্যে খেয়োখেয়ি। মিডিয়াও তুলে ধরছে রাজনৈতিক তৎপরতা বলতে মূলত এই ছবিটাই। মিডিয়ার এই প্রচার সুপরিকল্পিত। এর মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা বিশেষ উদ্দেশ্য হল, বাম প্রবণতাগুলোকে যত পারা যায় অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়া। আরও একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন ধরা পড়ছে, মিডিয়া তৃণমূলের পক্ষপাতিত্ব করে আসা থেকে ইতিমধ্যেই সরে গেছে, এখন শুধু মোদী আর বিজেপি ভজনায়।

এই তৃণমূল-বিজেপি কামড়াকামড়ি-রক্তারক্তির সাথে জনতার স্বার্থের কোন সম্পর্কই নেই। এতে না আছে কোন গণতান্ত্রিক জনমুখীতা, না আছে কোন ন্যায়-নীতিনিষ্ঠ অবস্থান। কেবল প্রতারণাই সার। প্রতিশ্রুতির প্রতারণার সাথে সাথে সমানে লক্ষ্যণীয় অস্বীকারের ঔদ্ধত্য, প্রত্যাখ্যানের স্বেচ্ছাচারিতা। তৃণমূল মনে করছে, রাজ্যে ক্ষমতায় আছি, থাকব, যা খুশী 'পরিবর্তন' করে চলব। বিজেপিও মনে করে তাই, কেন্দ্রে এসেছে, এবার রাজ্যেরও দখল নেবে। সংঘাতের মূল পয়েন্ট এখানেই। তৃণমূল শাসন সাড়ে তিন বছরের মধ্যে ভাবমূর্তি অনেকটাই হারিয়েছে। সেই তুলনায় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন মোদী মডেলের বয়স যদিও ছ-মাস, তবু তার 'সুদিন' নিয়ে আসার আসল চিত্রটা ধরা পড়ছে। মিডিয়ার রাঙানো 'উন্নয়নমুখী' বিজেপির কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী চেহারাটাই বুঝতে হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল এবং বিজেপি—উভয়কেই চেপে ধরার মতন দুর্বল ক্ষেত্রগুলোও রয়েছে।

তৃণমূল আমলের এখন সবচেয়ে বড় দুর্বল বিষয়টা হল সারদা কেলেংকারি। তার দমনতন্ত্র, দলতন্ত্র চালানো ইত্যাদি বহু গণ্ডগোলের প্রেক্ষাপট রয়েছে। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে প্রতিকূলতায় সবচেয়ে বেশী করে পড়তে হচ্ছে সারদা ইস্যুতেই। কোনো দাওয়াই কাজ দিচ্ছে না। এই একটা ইস্যুই যেন কাল ঘনিয়ে নিয়ে আসছে। এর সাথে বিজেপি খাগড়াগড় বিস্ফোরণের ঘটনা উপলক্ষে রাজনীতির সাম্প্রদায়িককরণের নতুন চাপ নামাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ নাকি এখন সংখ্যালঘু সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর! মুসলিম আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের যোগসূত্রে বাঁধা ঘাঁটি! খবরে প্রকাশ, খাগড়াগড় নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের গোয়েন্দাবাহিনী দুদেশে যাওয়া-আসা, তদন্ত ও গ্রেপ্তারী অভিযান চালাচ্ছে। কিন্তু খাগড়াগড়কাণ্ডের পেছনে প্রকৃত রহস্য কী? 'নিয়া' (এন আই এ)-র নিয়ত প্রচারিত রিপোর্ট এবং বিজেপির প্রচারে যেন মিলমিশ একাকার। সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকছে সবটাই যোগসাজশে চলছে। না হলে, বেসরকারি পরিদর্শন ও তথ্যানুসন্ধানের ওপর অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাখা হয়েছে কেন? প্রকৃত তথ্যকে আড়াল করতে এরকম বিধিনিয়ম চাপানো ও মিথ্যাচারের বহু জাতীয়-আন্তর্জাতিক নজীর রয়েছে। অন্যদিকে মমতা ব্যানার্জী বলছেন, এর পিছনে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর হাত থাকতে পারে। তিনি কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ঘর করেছেন এন ডি এ এবং ইউ পি এ— দুই সরকারের সাথেই, সেই সূত্রে তিনি দাবি করছেন কীভাবে কেন্দ্র থেকে কত কী ষড়যন্ত্র হয় তার অনেক কিছুই জানেন। প্রশ্ন হল, এসব তিনি এন ডি এ বা ইউ পি এ-তে থাকাকালীন বাইরে প্রকাশ করে দেননি কেন? তবে কী তৃণমূলের কোন খাস স্বার্থে চেপে যাওয়ার শেয়ার করতেন? জঙ্গলমহলে যৌথবাহিনীর অভিযানে শরিক হয়েছিলেন কেন? হত্যা আর গণ-বন্দীকরণে উন্মত্ত হয়েছিলেন কেন? সে বেলায় কেন্দ্রের দোসর হওয়া দোষের ছিল না? এখনই বা পুরোপুরি মুখ খুলছেন না কেন?

মমতা সরকারের ফিলহাল কিছু সংস্কারের ভাবনা যথেষ্ট প্রতারণার। কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও বিপনণের মাণ্ডি নির্মাণের বাপারে রাজ্য বিধানসভায় বিল পেশ করল, ঐ বিল প্রথমে আরও খতিয়ে দেখার নাটক করে যথেষ্ট বিতর্ক করতে না দিয়ে যেমনটা তৈরী করা হয়েছে ঠিক সেভাবেই পাশ করালো। মান্ডি নির্মাণের জন্য উদ্বাহু স্বাগত জানানো হল কর্পোরেটপুঁজিকে। এর ফলে 'মধ্যস্থতাকারিদের সরিয়ে দিয়ে সরাসরি উৎপাদকদের থেকে পণ্য কেনার' প্রচারের ধোঁকাবাজিই চলবে। আসলে কেনার পূর্বশর্ত হিসেবে ''চুক্তি চাষ'' ও মূল্য হ্রাসের সাঁড়াশী পলিসি প্রয়োগের ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে। পরিণতিতে বাড়বে কর্পোরেট পুঁজির পৌষমাস, উৎপাদক কৃষকের সর্বনাশ। মমতা সরকারের দুমুখোপনা হল, একদিকে 'খুচরো পণ্যে বিদেশী বিনিয়োগের বিরোধী', অন্যদিকে কৃষিপণ্যের মাণ্ডি নির্মাণে কর্পোরেট পুঁজির বিনিয়োগবান্ধব। দ্বিতীয়ত, উপনগরী নির্মাণ ও নব শিল্পায়নের নামে জমিনীতিতে ধরা পড়ছে মমতা সরকারের ভোলবদল। বেসরকারি পুঁজির আবদার মেটাতে শহরসংলগ্ন জমি বেচাকেনার বর্তমান ঊর্ধ্বসীমাকে শিথিল করার ভাবনা মোটামুটি সারা। ২৪ একরের ঊর্ধ্বসীমাকে ৫০ একরে পরিণত করা হবে। দ্বিগুণেরও বেশী পরিমাণ সীমা সুলভ করার পলিসি গ্রহণ হতে চলেছে। এই সরকার বলেছিল জবরদস্তি জমি নেওয়া হবে না, জমির বেচাকেনায় সরকার মধ্যস্থতাকারি হবে না। কিন্তু অণ্ডালে কি হচ্ছে? বিমানবন্দর তৈরীর নামে ১০৯ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল বিগত বামফ্রন্ট সরকার। তৃণমূল সরকার ঐ জবরদস্তি জমি গ্রাস প্রত্যাহার করেনি, বজায় রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রীর এক গলাবাজী—বিমানবন্দর ওখানে হবেই! কৃষক, ক্ষেতমজুর ও বর্গাদারদের ক্ষতিপূরণের দরাদরি মানতে সরকার কোনরকম রাজী নয়। অথচ ওখানে ৬০০-র বেশী চেক প্রত্যাখ্যান হয়ে রয়েছে। প্রায় ৩ হাজার বর্গাদার ও ক্ষেতমজুরদের জন্য ক্ষতিপূরণের কোন সংস্থানই রাখা হচ্ছে না, তাদের ক্ষতিপূরণের দাবি মাথা পিছু ৬ লক্ষ টাকা। অভিযোগ আরও রয়েছে। বর্তমান আমলে বিভিন্ন নির্মাণের নামে জমি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সংস্থাকে। যেমন, খড়গপুরে বি এ এস এফ (৩০ একর), ট্রাক্টর ইণ্ডিয়া (১১০ একর), পানাগড়ে জনসন টাইলস (৩৫ একর), পানাগড় ও শিলিগুড়িতে মারুতিকে (৬০ একর)। কিন্তু এই জমিগুলোতে হয় কাজ শুরু হয়নি, অথবা শুরু হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। সরকার কিন্তু জমির পুনর্দখলে নেই। জমিনীতির প্রশ্নে এই হল তৃণমূলের দ্বিচারিতার পরিচয়।

এখন বিজেপি সারদা কেলেংকারির ইস্যু সহ রাজ্যে 'উন্নয়ন' হচ্ছে না কেন বলে তৃণমূলের পেছনে যতই লাগুক মমতা সরকারের উপরোক্ত নয়া উদারবাদী সংস্কার পলিসি ও কর্মসূচী নিয়ে মুখ খুলছে না, খুলবে না। বিধানসভায় বসিরহাট উপনির্বাচনে জিতে বিজেপি-র একজন ঢুকেছেন, তিনি মাণ্ডি নির্মাণ জনিত মমতা সরকারের পেশ করা বিল নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন নি। কারণটা রয়েছে বিজেপি-র সাথে সাদৃশ্য থাকার মধ্যে, টি এম সি সরকারেরও ভাবনা ও অবস্থান যেহেতু কর্পোরেট পুঁজিমুখী। তবে নিজের ক্ষমতায় আসার আলাদা হাওয়ার প্রেক্ষাপট এখনও ভাঙ্গিয়ে চলার কথা ভাবা আর কর্পোরেট পুঁজির জন্য দরজা খুলে দেওয়া— এই দ্বৈততার সমাধান করার টানাপোড়েনে রয়েছে তৃণমূল। তাই কর্পোরেটমুখী 'উন্নয়ন পলিসি' রূপায়ণে তার নিজস্ব ধরণটা হল, ক্ষেত্র বুঝে বুঝে কিঞ্চিৎ ধীরগতির। আর বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার জোরে কর্পোরেটমুখী পলিসির সবচেয়ে জোরালো ও দ্রুত সর্বাত্মক রূপায়ণের পক্ষে। এই হচ্ছে উভয়দলের দুর্বল দিক, যে দুর্বলতায় কিছু তারতম্যের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখন বিজেপির কর্পোরেটমুখী পলিসির চাপের মুখে তৃণমূলের পক্ষে আরও খোলাখুলি ও আরও ব্যাপকভাবে কর্পোরেট সাধন-ভজনের জন্য নিজের পরিবর্তনমুখী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অন্যদিকে, কেন্দ্রের মোদী সরকার এই শীতকালীন অধিবেশনেই কতকগুলো কালা বিল পাশ করাতে মরীয়া। বিলগুলো হল বীমা বেসরকারিকরণ, নয়া জমি অধিগ্রহণ (সংশোধনী) বিল, বিলগ্নীকরণ বিল, শ্রম আইনের সংস্কার বিল, কয়লা খনি বিল, দিল্লী পুলিশ স্পেশ্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট (সংশোধনী) বিল, পরমাণু নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ বিল, পরমাণু শক্তি ও দায়বদ্ধতা (সংশোধনী) বিল ইত্যাদি। মোট বিলের সংখ্যা ৬৭, তার মধ্যে লোকসভায় পেশ করানোর ৮টি, বাকী ৫৯টি রাজ্যসভায় পাশ করাতে হবে। এই ব্যাপারে বিজেপি লোকসভায় পার পেয়ে যাবে, কারণ একক গরিষ্ঠতা রয়েছে। কিন্তু রাজ্যসভায় মুশকিল আছে। তৃণমূলও বলছে রাজ্যসভায় বিজেপিকে বীমা বিল পাশ করতে দেবে না। সে তো সময়েই বোঝা যাবে তৃণমূলের ভূমিকা। তৃণমূল ইতিমধ্যে সারদা প্রশ্নে বিজেপির আক্রমণের মোকাবিলায় পাল্টা কিছু প্রশ্ন তুলছে সংসদে। প্রতিবাদও সংগঠিত করছে সংসদের বাইরে। ইস্যু করছে সাহারা গোষ্ঠীর অর্থলুঠের কারবারের সাথে অমিত শাহ্‌র জড়িত থাকার তথ্যপ্রমাণ দাবি করা 'লাল ডায়েরী'কে, কালো টাকা বিদেশ থেকে ফেরত আনার মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতিভঙ্গকে। এমনিতে ন্যায্য চাপ। কিন্তু চাপ সৃষ্টি করতে খুব বেশী দূর যাওয়া তৃণমূলের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি বিজেপি যে কালো টাকার গ্রহীতা, ক্ষমতায় আসার জন্য মোদী বাহিনীর পেছনে যে ১৫ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে, শুধু বিজেপি কেন, কংগ্রেস সমেত শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন দলগুলো বিশেষত কালো টাকার কালচারে যে অভ্যস্ত, সেসব নিয়ে প্রশ্ন তোলার মুখ তৃণমূলের নেই। কেননা নিজে সারদা কেচ্ছায় জড়িয়ে বিজেপির মুখোশ খুলতে কীভাবে আর চীলচিৎকার করবে! মোদী সরকারের তরফে তৈরী বিলগুলো যেমন জনবিরোধী, তবে সেগুলোর কার্যকরিভাবে উন্মোচিত করার নীতি-নৈতিকতার জোর তৃণমূলের নেই। এভাবে একটি বিন্দুতে এসে আপাতদৃষ্টিতে যুযুধানরত শাসকশ্রেণীর দুটি দলের দুর্বল পয়েন্ট একাকার।

তৃণমূল 'কেন্দ্রের বঞ্চনা'-'কেন্দ্রের অপমান' ইত্যাদি কেন্দ্রবিরোধী জিগির তুলেছে, কলকাতায় পেছন থেকে টলিউড-টেলিউডের শিল্পী ও তথাকথিত বিদ্বজ্জনদের পথে নামাচ্ছে। কিন্তু জনারণ্যে বিশ্বাসযোগ্য ছাপ ফেলতে ব্যর্থ হচ্ছে। মোদী সরকার যোজনা কমিশন তুলে দিল, এম এন আর ই জি এ-র কর্মসংস্থানের বিরাট সংকোচন করল, ১ লক্ষ ৬,৬৮৪ কোটি টাকার কর্পোরেট কর ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল; এসব নিয়ে তৃণমূল আনুষ্ঠানিক মতপার্থক্য শুধু রেখেছে, সংসদের ভেতরে বা রাজ্যে কোন ঝড় তোলেনি। কেন্দ্রের দ্বারা বঞ্চনা-অপমানের ইস্যুটাকে ব্যবহার করছে সারদার চাপ সরাতেই। তার ওপর সারদা প্রতারণার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠছে বৈষম্য ও দুর্নীতি নিয়ে, হিসাবের কারচুপি নিয়ে। ফলে তৃণমূল বিশ্বাসযোগ্যতা পাবে কেন? পাওয়ারই নয়।

এইসব কারণে এ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্থিতাবস্থা ভাঙতে শুরু করেছে, নতুন অস্থিরতা তৈরী হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে কোন্ ধারার শক্তি কেমন ফসল তুলবে সেই অগ্নিপরীক্ষা সামনে। বিজেপির মোকাবিলায় নিজের সংকটের ঠ্যালায় তৃণমূলনেত্রী 'বিহার ফর্মূলা' থেকে শুরু করে কংগ্রেস-সি পি এম সব নিয়ে জগাখিচুড়ি 'ধর্মনিরপেক্ষ' সখ্যতা ইত্যাদি যা জোটে চাইছেন। অতি সম্প্রতি রাজধানীতে তৃণমূলেরই বিশেষ তৎপরতায় কংগ্রেসকে সামনে রেখে বিজেপি-বিরোধী ধর্ণার আয়োজন হতে দেখে কোন কোন বাম নেতার বোধহয় সব ঝুড়িতে ডিম রাখার সুবিধাবাদী ভাবনা মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল! কংগ্রেস সবচেয়ে ব্যাকফুটে, যত ক্ষয়িষ্ণু হয় ততই ভালো। কংগ্রেসের মধ্যে চলছে দোনামনা—তৃণমূলের হাত ধরবে নাকি প্রথাগত বামেদের সঙ্গে নেবে। সি পি এমের মধ্যেও বিচিত্র দুলুনি—কংগ্রেসের সঙ্গে থাকবে নাকি ব্যাপক বামপন্থী শক্তিগুলোর স্বতন্ত্র যুক্ত অভিযাত্রায় চলবে। এইসব প্রবণতাগুলো রয়েছে।

প্রধান টার্গেট বিজেপির আগ্রাসনকে মোকাবিলার কার্যকরি প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে বামপন্থী শক্তিগুলোর স্বাধীন সংগ্রামী যুক্ত উদ্যোগ। আশার কথা, পশ্চিমবঙ্গে এরকম দুটি আলাদা বৈশিষ্ট্যের যুক্ত কার্যকলাপ চালানোর নতুন প্রয়াস শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগগুলোতে সংগ্রামী বামপন্থার প্রতিনিধিত্বকারী শক্তি সি পি আই (এম এল) লিবারেশন বলিষ্ঠভাবেই রয়েছে। সি পি এমের অধঃপতন ডেকে এনেছিল তৃণমূলী তান্ডবের 'পরিবর্তন', এখন তৃণমূলের 'পরিবর্তন' ডেকে আনছে বিজেপির আগ্রাসন। এর বিরুদ্ধে এখন তাই এক নতুন শক্তিশালী স্বতন্ত্র যুক্ত বামপন্থী প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার পথ নেওয়াই হবে যথার্থ প্রত্যুত্তর।

- অনিমেষ চক্রবর্তী

বজবজে সি ই এস সি-র শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার দৌলতে শিল্প মালিকরা যেন স্বর্গ পেয়ে গেছে! শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নয়া শিল্পনীতির আক্রমণ নামিয়ে আনছে তীব্রভাবে। একে বৈধতা দিতেই মোদী সরকার শ্রম আইনের নয়া কালা সংস্কার চাপাতে চলেছে। এরাজ্যের মমতা সরকারও এসব মেনে নিচ্ছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে যে সমস্ত শ্রমিক আন্দোলন সেই লড়াইগুলোকে দমিয়ে দিতে তৃণমূলের রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল চালিত ট্রেড ইউনিয়ন একযোগে আক্রমণ নামাচ্ছে।

এরকম আক্রমণ নেমেছে বজবজে শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কাদের সি ই এস সি-র জেনারেটিং স্টেশনে। সি ই এস সি মুনাফার কারবার তেজী করতে একদিকে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ওপর সারচার্জের নামে প্রায়শ মূল্যবৃদ্ধি করেই চলেছে, অন্যদিকে শ্রমিক ছাঁটাই করে কাজের বোঝা ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। অতি মুনাফার উদ্দেশ্যে সি ই এস সি কর্তৃপক্ষ প্রায় ২০ বছর আগে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি জেনারেটিং স্টেশন তৈরী করেছিল বজবজে। তা করতে গিয়ে প্রথম থেকেই বেআইনী ও অন্যায়ের রাস্তা নিয়েছিল। প্রথমত, তৎকালীন রাজ্য সরকার ও শাসকদলের মদতে খুব কম পরিমাণে আর্থিক ক্ষতিপূরণের মূল্যে প্রচুর মানুষকে উচ্ছেদ করে জমি গ্রাস করেছিল। অনেকে ক্ষতিপূরণ আজও পান নি। দ্বিতীয়ত, মাত্র ৪০ শতাংশ স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করে বাকী ৬০ শতাংশ স্থায়ী কাজের ক্ষেত্রে অস্থায়ী

আটের পাতায় দেখুন

আজকের বিহার ঃ উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ এবং প্রকৃত বাস্তবতা

(সি পি আই (এম এল)-এর বিহার রাজ্য কমিটি বিস্তৃত সমীক্ষা চালিয়ে যে রিপোর্ট তৈরি করে এবং প্রকাশ করে তার অংশ বিশেষ)

মুখবন্ধ

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে বড় মন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে উন্নয়ন। সরকারি নীতিকে যতই বেসরকারিকরণ এবং প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের বেদীমূলে উৎসর্গ করা হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ী মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতি যতই আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠছে, উন্নয়ন নিয়ে জিগির ততই জোরালো হয়ে উঠছে। বিহারে উন্নয়ন নিয়ে সরকারি বুলিকে সবসময়েই রঞ্জিত করা হয় ন্যায়ের শ্লোগান দিয়ে। লালু প্রসাদ সামাজিক ন্যায়ের বুলি আউড়ে পনের বছর শাসন করেছেন; নীতীশ কুমার একদিকে 'মহাদলিত', 'অতিপিছড়া' এবং 'পসমন্দা' মুসলিমদের ন্যায়ের সাথে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং অন্যদিকে বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার চালিয়েছেন, আমির দাস কমিশনকে ভেঙ্গে দিয়েছেন এবং ভূমি সংস্কার ও অভিন্ন স্কুল ব্যবস্থার সুপারিশ করা বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশন এবং মুচকুন্দ দুবে কমিশনের রিপোর্টকে খারিজ করেছেন।

এই সমস্ত প্রতিশ্রুতির পথ ধরে এসেছে লম্বা-চওড়া দাবি। বিহার সরকারের দাবি, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৃদ্ধির হার অভূতপূর্ব মাত্রায় হয়েছে। আমাদের জানানো হচ্ছে, অর্থনীতির এই বৃদ্ধির ফলে শুধু পরিকাঠামোর উন্নতিই ঘটেনি, দারিদ্র এবং মজুরদের অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া অনেক হ্রাস পেয়েছে এবং মানুষ অনেক বেশি করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছেন। বিজেপি যতদিন বিহারে ক্ষমতার অংশিদার ছিল ততদিন সুশীল মোদীই বিজেপি-জে ডি (ইউ) সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছেন এবং প্রধান পরিসংখ্যান প্রচারক হয়ে উঠেছিলেন। ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর বিজেপি এখন জে ডি (ইউ) সরকারের দাবিগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। যে আর জে ডি এবং কংগ্রেস আগে নীতীশ কুমার সরকারের সাফল্যকে খণ্ডন করত তারা এখন এই সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে উঠেছে।

বিহারের জনগণকে যখন প্রতিদিনই বঞ্চনা এবং অধিকার হরণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে, তখন সরকারি পরিসংখ্যানের এই লম্বাচওড়া দাবি তাদের কাছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে হয়েই উঠেছে। বিহারের সর্বত্রই বি পি এল তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার অভিযোগ ব্যাপক মাত্রায় রয়েছে। আমাদের সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, ভোটার তালিকা থেকেও বহু সংখ্যক মানুষ বাদ পড়েছেন। গত বছরের শেষ থেকে এ বছরের গোড়ার দিক পর্যন্ত চালানো সরকারের আর্থ-সামাজিক জনগণনায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ধারণের প্রকৃত অবস্থা নিয়ে একরকম তামাশাই করা হয়েছে। জনগণনা নিয়ে চলা যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিহারে সম্ভবত এই প্রথমবার এত ক্ষোভ দেখা গেল।

এই পৃষ্ঠভূমিতে বিহারের কমরেডরা জনগণের কাছে গিয়ে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন যাতে করে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক আইন ও প্রকল্পের রূপায়ণ কিভাবে হচ্ছে সে সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পাওয়া যায়। এই সমীক্ষার নাম দেওয়া হয়েছিল 'গ্রামীণ বাস্তবতা এবং জনগণের অধিকারের অবস্থা'। ২০১৪-এর জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ২৩টি জেলায় সমীক্ষা চালানো হয়, ১৬৮টি ব্লকের অধীন ৮২৬টি পঞ্চায়েতের ১৩১৪টি গ্রামের ২,০০,১০৬ পরিবার এবং শহরাঞ্চলের ৯টি শহরের ৪৫টি ওয়ার্ডের ৬৬৩৪টি পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরিবারগুলোর কাছে দেওয়া বিশদ প্রশ্নাবলীর ভিত্তিতেই ঐ সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়। কয়েক শত সি পি আই (এম এল) কর্মী এবং স্থানীয় যুবক আন্তরিকতা এবং উদ্দীপনার সাথে এই পরিশ্রম সাধ্য উদ্যোগে সামিল হন। পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরে ৫০০টিরও বেশি জনশুনানির মধ্যে দিয়ে সংগৃহীত তথ্য স্থানীয় স্তরে জনগণের কাছে রাখা হয়।

সমীক্ষা ঃ এক নজরে

সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত মোট পরিবার	২০৬৭৪০	
গ্রামীণ পরিবার	২০০১০৬	
শহরাঞ্চলের পরিবার	৬৬৩৪	
ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া নাম	১৩৪০৯৮	(২৩.৯ শতাংশ)
মোট গ্রাম	১৩১৪	
পঞ্চায়েত সংখ্যা	৮২৬	
ব্লক সংখ্যা	১৬৮	
জেলা	২৩	
ওয়ার্ড সংখ্যা	৪৫	
নগর নিগম অঞ্চল	৩	
নগর পরিষদ	১	
নগর পঞ্চায়েত অঞ্চল	৪	
সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলোর সামাজিক কাঠামো		
দলিত/মহাদলিত/উপজাতি	৯২৪০৯	(৪৪.৬ শতাংশ)
অতি পশ্চাদপদ	৫০২৫৪	(২৪.৩১ শতাংশ)
পশ্চাদপদ	৩২৫৮৯	(১৫.৭৬ শতাংশ)
সংখ্যালঘু	২৩৬৭১	(১১.৪৫ শতাংশ)
অন্যান্য	৭৮১৭	(৩.৭৮ শতাংশ)

সমীক্ষাকাল—জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

এই সমীক্ষার নমুনার জন্য মূলত গ্রাম ও শহরের দরিদ্রদেরই বেছে নেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে যে পরিবারগুলোর মধ্যে সমীক্ষা চালানো হয় তাদের ৬০ শতাংশই সম্পূর্ণরূপে ভূমিহীন এবং ৩০ শতাংশের অল্প কিছু বেশি পরিবারের এক একর বা তার চেয়ে কম অতি ছোট জোতের জমি রয়েছে। জাত ভিত্তিক বিচারে দেখা যাচ্ছে, ৪৫ শতাংশ পরিবার হল বিভিন্ন দলিত জাতের, ২৫ শতাংশ অত্যন্ত পশ্চাদপদ জাতের, ১৫ শতাংশ অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতের এবং ১০ শতাংশের কিছু বেশি মুসলিম সম্প্রদায়ের। অন্যভাবে বললে, নমুনা মূলত সেই সমস্ত পরিবার থেকেই সংগৃহীত হয়েছে যাদের রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক আইন ও প্রকল্প থেকে লাভবান হওয়ার কথা।

এই রিপোর্ট এখন আমরা বিহারের জনগণের কাছে প্রকাশ করছি। পঞ্চায়েত স্তরের জনশুনানিগুলোর পর জনগণের প্রাপ্য কিছু অধিকার আদায়ের জন্য স্থানীয় স্তরে জনগণের কিছু আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। আমরা আশা করি, ন্যায্য উন্নয়নের জন্য এক বিকল্প দিশা ও এজেণ্ডার বিকাশ ঘটাতে এই রিপোর্ট আমাদের সাহায্য করবে এবং তা জনগণের বুনিয়াদি অধিকার আদায়ের জন্য এক ব্যাপক-ভিত্তিক আন্দোলনের ভিত্তিও রচনা করবে। এই সমীক্ষা অভিযানে যুক্ত অনেক কমরেডের কাছেই এটা ছিল এই ধরণের প্রথম কাজ। আমরা অবশ্যই আশা করব, এই অভিযান তথ্য থেকে সত্য অনুসন্ধানের মার্কসবাদী অভ্যাস গড়ে তুলতে, আমাদের চারপাশের বাস্তবতার প্রণালীবদ্ধ অধ্যয়নে প্রয়াসী হতে এবং জনগণের স্বার্থে এই পরিস্থিতিকে পাল্টানোর লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ লড়াই চালাতে আরও বেশি সংখ্যক কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করবে।

- দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

সমীক্ষা ঃ এক সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ

১। বিহারে ২৩টি জেলার ১৬৮টি ব্লকে ৮২৬টি পঞ্চায়েতের ১৩১৪টি গ্রামে সমীক্ষা চালানো হয়। যে পরিবারগুলোর মধ্যে সমীক্ষা চালানো হয় সেগুলোর সামাজিক কাঠামো থেকে সুস্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে, সেগুলো মূলত দরিদ্র পরিবার। ২,০০,১০৬ পরিবারের মধ্যে দলিত-মহাদলিত-উপজাতি পরিবারের সংখ্যা ছিল ৪৪.৯ শতাংশ; চরম পশ্চাদপদ, পশ্চাদপদ সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য পরিবারের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৪.৪৬ শতাংশ, ১৫.৮৯ শতাংশ, ১০.৮১ শতাংশ এবং ৩.৮২ শতাংশ। শহরাঞ্চলের ৬টি জেলার ৪৫টি ওয়ার্ডের ৬,৬৩৪টি পরিবারের মধ্যেও সমীক্ষা চালানো হয় এবং এগুলোও ছিল মূলত দরিদ্র পরিবার।

সমীক্ষা রিপোর্ট মূলত গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে, আর শহরাঞ্চল থেকে সংগৃহীত তথ্যের ফলাফল একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে রাখা হয়েছে। বৃহত্তর ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে, গ্রাম ও শহরের দরিদ্রদের মধ্যে বঞ্চনা একেবারে একই ধরণের।

২। গ্রামাঞ্চলের যে ২,০০,১০৬টি পরিবারের মধ্যে সমীক্ষা চালানো হয়েছে তাদের ৬০.৭৪ শতাংশ পরিবারই ভূমিহীন। এই ভূমিহীনতার ভিত্তি হল কৃষি জমি; অর্থাৎ, এই সমস্ত পরিবারের চাষের জন্য কোন জমি নেই। এক একর পর্যন্ত জমি রয়েছে এমন পরিবারগুলোকে যদি এর সঙ্গে যোগ করা হয় তবে হারটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ৯২.২ শতাংশ। এই সমস্ত পরিবারই ভূমি সংস্কারের আওতায় পড়ে, কিন্তু ভূমি সংস্কার থেকে লাভবান হয়েছে মাত্র ৫.৫৮ শতাংশ। লাভবান হওয়া পরিবারগুলোর ২৪.৯ শতাংশ এখনও পর্চা জমির ওপর অধিকার পায়নি। এই ছবিটা কংগ্রেস জমানা থেকে লালু-রাবড়ি এবং জে ডি ইউ-বিজেপি জমানার সরকারগুলোর জমিদারপন্থী চরিত্রকে দেখিয়ে দিচ্ছে। সরকার গঠিত সংস্কার কমিশন ভূমি ও প্রজাস্বত্ব সংস্কারের কিছু ন্যূনতম সংস্কারের সুপারিশ করা সত্ত্বেও জে ডি ইউ-বিজেপি সরকার ভূমি সংস্কারের এজেণ্ডাকে পরিত্যাগ করে দরিদ্রদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে।

৩। এই সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে কৃষির সঙ্গে যুক্ত ৭২,৩৯১ পরিবারের মধ্যে ৪৭,৮৪১ পরিবার ভাগ চাষী। অর্থাৎ, বিহারে চাষবাসের একটা বড় অংশই হয় ভাগচাষের মাধ্যমে। কৃষি ক্রমেই অলাভজনক হয়ে ওঠায় এবং জীবিকার নতুন নতুন পথ খুলে যাওয়ায় প্রত্যক্ষ চাষবাসের হার যথেষ্ট মাত্রায় কমে গেছে। ভাগচাষের হার বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ফসল ভাগাভাগির পুরনো ধরন দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং কৃষির পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলোতেই তা প্রধানত বিদ্যমান রয়েছে। যে সমস্ত অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো এবং কৃষিতে উন্নতি বেশি হয়েছে, সেখানে নগদ টাকা বা ফসলের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট খাজনা ভিত্তিক প্রজাস্বত্বই মোটামুটি চালু রয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৫৬.৩১ শতাংশ ভাগচাষীকে খাজনা হিসাবে স্বেচ্ছাচারীভাবে নির্ধারিত টাকা বা ফসল দিতে হয়। সরকার পুরনো প্রজাস্বত্ব আইনকে তুলে দিয়েছে, যে আইনের বলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের প্রজাস্বত্বের পর জমির মালিকানা ভাগচাষীর কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার বিধান ছিল; কিন্তু লিজ নেওয়া জমিতে খাজনাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা ইজারাদারকে সহায়তা করার জন্য কোন আইন নেই। অর্থাৎ, পুরনো আইনও এখন নেই, আবার তার জায়গায় নতুন কোন আইনও তৈরি হয়নি; সরকার জমিদারের স্বেচ্ছাচার এবং দাবিকেই রাজ্যের আইন বলে গণ্য করে। এক নতুন প্রজাস্বত্ব আইন অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে, বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশন সুস্পষ্টভাবেই যেটা বলেছিল।

৪। বিহারে আজও জনগণের ব্যাপক অংশই কৃষি ও তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাজেই যুক্ত, কিন্তু এই ক্ষেত্রের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী উদাসিনতা ও অবহেলায় পূর্ণ। বিহারে ব্যাপক সংখ্যক কৃষি শ্রমিক রয়েছে, কিন্তু আজও তাদের কল্যাণে কোন আইন তৈরি হয়নি। পশুপালন থেকে আয়ের একটা ভালো অংশ আসে এবং কৃষিতে যুক্ত জনগণের একটা বড় অংশই তা সৃষ্টি করেন। পশুপালনের বিকাশ, সুরক্ষা এবং বাজার লাভ করার ক্ষেত্রে সরকারি পদক্ষেপগুলো অত্যন্ত দুর্বল। ভাগচাষী সহ সমস্ত কৃষকদেরই কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা পাওয়ার কথা, কিন্তু আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে ১০ শতাংশ পরিবারও এই সুবিধা পায় না। ফসল নষ্টের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং ডিজেলের জন্য ভর্তুকিকে শূন্যগর্ভ বুলিতে পর্যবসিত করা হয়েছে। কৃষি ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলোর পক্ষে সাধ্যায়ত্ত ও যথেষ্ট পরিমাণ কৃষি ঋণ সহজে পাওয়াটা একান্তই দুর্লভ ব্যাপার। মাত্র ২.৪৯ শতাংশ কৃষি ঋণ পেতে সমর্থ হয়েছে।

৫। সমীক্ষা এই বিষয়টার সত্যতাকে প্রতিপন্ন করেছে যে, বিহারের জনগণের এক বড় অংশ কৃষি ক্ষেত্রের বাইরেই তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করছেন। কৃষি ক্ষেত্রের বাইরের মজুরদের এক বড় অংশই নির্মাণ এবং অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করছেন। তাদের উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য সরকারি প্রচেষ্টা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর এবং সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর বাস্তবে কোন প্রয়োগ দেখা যায় না। চুক্তি/সম্মানদক্ষিণার ভিত্তিতে নিযুক্তির সূত্রটা সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পেয়েছে এবং তাতে কাজ পাওয়ার নিশ্চয়তা বা ন্যূনতম মজুরিকে বলবৎ করার কোন বিধান নেই। সরকার নিজেই ন্যূনতম মজুরি আইন ভাঙ্গার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এর ফলে বেসরকারি ক্ষেত্র ন্যূনতম মজুরি বা অন্য কোন সুরক্ষা-ব্যবস্থার তোয়াক্কা না করে কর্মীদের কাজের সামর্থ্য ও দক্ষতাকে নিংড়ে নিচ্ছে। স্কুলগুলোতে মিড-ডে-মিল প্রকল্পে নিযুক্ত মহিলারা

পাঁচের পাতায় দেখুন

আজকের বিহার ... প্রকৃত বাস্তবতা

চারের পাতার পর

বছরে মাত্র ১০০০০ টাকা করে পান, কিন্তু তাঁদের কাজটা স্থায়ী চরিত্রের এবং কাজের সময়কাল শিক্ষকদের মতই। আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সম্মানদক্ষিণার ভিত্তিতে নিযুক্ত অন্যান্য কর্মীদের অবস্থাও মোটামুটি একইরকম। হাসপাতাল, নার্সিংহোম, স্কুল এবং নানা ধরণের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ন্যূনতম মজুরি আইনকে প্রকাশ্যেই লঙ্ঘন করে চলেছে।

৬। ২,০০,১০৬ পরিবারের মধ্যে ৯২.১৯ শতাংশ পরিবার ভূমিহীনতা এবং চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, এ সত্ত্বেও মাত্র ৮১,০৯২টি পরিবার জবকার্ড পেয়েছে। অন্যভাবে বললে, মাত্র ৪০.৫২ শতাংশ পরিবার জবকার্ড পেয়েছে, যদিও মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন অনুযায়ী সমস্ত দরিদ্র পরিবারেরই এর আওতায় আসার কথা। যারা আবার জবকার্ড পেয়েছে তাদের মধ্যে ২৭.২৩ শতাংশের কার্ড তাদের নিজেদের কাছে নেই, সেই সমস্ত কার্ড বেআইনিভাবে নিজেদের কাছে রেখেছে সংশ্লিষ্ট মুখিয়া বা রোজগার সেবকরা। জবকার্ড থাকা পরিবারগুলোর ৬৪.৩৮ শতাংশ এ বছর একদিনও কাজ পায়নি। ১৫.২১ শতাংশ পরিবার ১ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত কাজ পেয়েছে এবং ১১.০৮ শতাংশ পরিবার পেয়েছে ৮ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত কাজ। এই পরিসংখ্যানগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে যে, দিল্লী ও পাটনার সরকার পারস্পরিক যোগসাজশে গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনের মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে তুলতে চাইছে। চূড়ান্ত কম মজুরি, চরম ঢিলেঢালা ও উদাসীন প্রশাসন এবং সর্বব্যাপী দুর্নীতির প্রকোপে ঐ কর্মসংস্থান প্রকল্পের গোড়ার দিকের উদ্দীপনা অনেকটাই মিলিয়ে গেছে। আমাদের সমীক্ষা আরও দেখিয়েছে যে, এম এন আর ই জি এ মজুরদের অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ার পরিঘটনায় কোন প্রভাবই ফেলতে পারেনি। অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা কমে আসার সরকারি দাবির বিপরীতে আমাদের সমীক্ষা দেখাচ্ছে ৪০.০৭ শতাংশ পরিবারের সদস্যরা বেঁচে থাকা বা ভালো মজুরির জীবিকার জন্য অন্যরাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

৭। সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য ও পরিসংখ্যান আবাসন এবং বাস্তুজমির সংকট সম্পর্কে এক ভয়ঙ্কর ছবিকে তুলে ধরে। সমীক্ষা দেখাচ্ছে, ২৯.৭৪ শতাংশ গ্রামীণ দরিদ্র পরিবার আজও বসতবাড়ির জমির মালিকানার কাগজ পায়নি। তারা ১৯৪৮ সালের পি পি আইনের অধীনে বাস্তু জমির রেকর্ড করাতে পারেনি, আবার মহাদলিত পরিবারগুলোকে বাড়ি তৈরীর জন্য ৩ ডেসিবেল করে জমি দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেই প্রকল্পের কোন সুবিধাও পায়নি। মাত্র ৫.০৭ শতাংশ পরিবার বাড়ির জমির কাগজ পেয়েছে এবং এই পর্চা পাওয়া পরিবারগুলোর ২৬.১৬ শতাংশ আবার জমির অধিকার এখনও পায়নি। ৬৭.১৫ শতাংশ পরিবারের বাড়িতে একটার বেশি ঘর নেই। এমন দৃষ্টান্তও আমরা পেয়েছি যেখানে একটি যৌথ পরিবারের ১৯ জন সদস্য তাদের জিনিসপত্র ও গবাদি পশু সহ এক ঘরওয়ালা বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়। ৩০ বছর পর বি পি এল পরিবারগুলোর অর্ধেকও ইন্দিরা আবাস পায়নি। যে পরিবারগুলো ইন্দিরা আবাস পেয়েছে তাদের মধ্যে ৫১.১৯ শতাংশের বাড়ি এখনও পুরো তৈরি নয়। পানীয় জলের সংকট ভয়াবহ। স্বচ্ছ ভারত অভিযান বা এর আগে তার অবতার নির্মল গ্রাম যোজনা দরিদ্র টোলাগুলোতে পৌঁছায়নি এবং যে অনুদান দেওয়া হয় স্থায়ী শৌচাগার তৈরির পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে ব্যাপক ঢাক পেটানো হলেও মাত্র ১৫.০৪ শতাংশ পরিবার বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছে, কিন্তু ভুয়ো বিদ্যুৎ বিলের ধাক্কায় তারা বিপর্যস্ত হয়। সরকার বি পি এল পরিবারগুলোর জন্য ঘোষিত কুটির জ্যোতি যোজনাকে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর।

৮। বিহারে দরিদ্র এবং দারিদ্রের পরিমাপ সম্পর্কিত সমস্ত সমীক্ষাই বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সম্প্রতি যে আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা চালানো হয়, ব্যাপক বৈষম্যের জন্য তা গ্রামের পর গ্রামে বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। আমাদের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে বি পি এল হওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ৪৫.৬৯ শতাংশ পরিবার আজও ঐ তালিকার বাইরে রয়েছে, ফলে বি পি এল পরিবারগুলোর প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। বিহারে ৮০ শতাংশেরও বেশি পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা আইনের আওতায় আসার কথা, কিন্তু এদের এক ভালো অংশই এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে এই প্রকল্পের অধীনে ৫০.৫৪ শতাংশ পরিবার রেশন কার্ড পায়নি। যে সমস্ত পরিবারের কার্ড রয়েছে তাদের ৩২.০৫ শতাংশ কোনও রেশন পায়নি, আর ৩.৭৬ শতাংশ পরিবার পেয়েছে ৪ মাসের রেশন, ১.৫৭ শতাংশ পেয়েছে ৫ মাসের রেশন এবং ০.২৬ শতাংশ পেয়েছে ৬ মাসের রেশন।

৯। সরকার যেখানে দাবি করে থাকে যে ১০০ শতাংশ শিশুই স্কুলে ভর্তি হয়েছে, আমাদের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ঐ হার ৮৩.৮৩ শতাংশ। মুসাহার/মহাদলিত টোলাগুলোতে ঐ হার অনেক কম। আজও ১৬.১৬ শতাংশ শিশু স্কুলের চৌকাঠ পেরোতে পারেনি। প্রাথমিক শ্রেণীগুলোতে ভর্তি হওয়া শিশুদের এক বড় অংশই দারিদ্রের কারণে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে, বেশিরভাগ স্কুলের শৌচাগারই হয় পরিত্যক্ত আর না হয় ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় রয়েছে, কেননা সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। স্কুলগুলোতে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী, সাফাই কর্মী বা নৈশ প্রহরী রাখার কোনও ব্যবস্থাও নেই। অত্যাবশ্যকীয় এই ব্যবস্থা বলবৎ করলে কয়েক লক্ষ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হতে পারে। ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলা শিক্ষার খরচ বহন করা দরিদ্রদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সর্বজনীন বৃত্তির ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে ৫৩.৯৬ শতাংশ শিশু বৃত্তি পায় না। এমনকি যে সমস্ত শিশু বৃত্তি পায় তাদের ক্ষেত্রেও সেটা নিয়মিত হয় না। মিড-ডে-মিল-এর নামে সমস্ত স্কুলেই উপস্থিতি নিয়ে কেলেঙ্কারি চলছে। এর সঙ্গেই আবার খারাপ উপস্থিতির জন্য শিশুরা বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষার অধিকার আইনে সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর ছাত্রদের জন্য ২৫ শতাংশ সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে বিহারে তার লঙ্ঘন অত্যন্ত প্রকট। সমীক্ষায় দেখা গেছে, বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি হওয়া ২৭,০৮৬টি ছাত্রের মধ্যে মাত্র ২৮ জনকে শিক্ষার অধিকার আইনের সংরক্ষণ বিধি মেনে ভর্তি করা হয়েছে যা সমগ্রের মাত্র ০.১ শতাংশ বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে।

১০। সমীক্ষা দেখিয়েছে, বিহার আরও একবার সুদখোরির ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে। সামান্য সম্পদ থাকা ৭৩,২৩৯টি পরিবারের বেসরকারি মহাজনদের কাছে ঋণ রয়েছে এবং গড় হিসাবে প্রতিটি পরিবারের মাথায় রয়েছে ৩৪,৩৪৬ টাকা ঋণ। গ্রামগুলোতে সুদ ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠছে এবং সুদের হার ৬০ শতাংশ থেকে ১২০ শতাংশ পর্যন্ত। যাদের এই রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে চলে যেতে হয় তাদের প্রায়শই এক বছরের মধ্যে দ্বিগুণ টাকা শোধ করতে হয়, অন্যথায় বাড়ি ফিরে এসে পরিবারের সদস্যদের সুদে টাকা ধার দেওয়া ব্যক্তির কাছে বিনা পারিশ্রমিকে খাটতে হয়। সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ব্যাঙ্ক ঋণের তুলনায় মহাজনি ঋণের পরিমাণ ৬ গুণ বেশি। স্পষ্টতই, ব্যাঙ্ক এবং সহজ, সাধ্যায়ত্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের লভ্যতার অভাবের কারণে সুদখোরি ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত ঘটছে। সহজ ও সাধ্যায়ত্ত ঋণের লভ্যতা না থাকলে প্রধানমন্ত্রীর জন ধন যোজনাও নিষ্ফলা হয়ে পড়বে। সারা দেশের মধ্যে বিহারেই ক্রেডিট-জমার অনুপাত সবথেকে কম এবং এর ধাক্কাটা দরিদ্রদের ওপরই পড়ে।

১১। আমাদের সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত লজ্জাকর আর একটা বিষয় বেরিয়ে এসেছে। বিহারে আজও এমন অনেক মন্দির রয়েছে যেগুলোতে দলিত ও মহাদলিতদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। গোচারণ ভূমি এবং পুকুরের মত জলাধারগুলোও আধিপত্যকারী অংশের নিয়ন্ত্রণে। ভোটার তালিকা থেকেও দরিদ্রদের নাম বাদ দেওয়া হয় এবং তারা ভোটার আই ডি কার্ড পায় না। সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে ২৩.০৯ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের নাম ভোটার তালিকায় নেই। বুথ দখলের মধ্যে দিয়ে ভোটাধিকার হরণের বিপদকে কাটিয়ে ওঠার পর দরিদ্ররা এখন আবার নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, আর সেটা হল সুপরিকল্পিত, প্রণালীবদ্ধ ও দুরভিসন্ধিমূলকভাবে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক বঞ্চনার বিপদ।

১২। সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে তীব্র আঞ্চলিক বৈষম্যও বেরিয়ে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, দূরবর্তী পশ্চাদপদ জেলাগুলোর তুলনায় পাটনা সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে অনুমোদনের ভিত্তিতে তৈরি ইন্দিরা আবাস প্রকল্পে বাড়ির কেন্দ্রীভবন অনেক বেশি। পাটনা সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে ঐ আবাসের সংখ্যা যেখানে সমীক্ষাভুক্ত ৪৯,৩৮০টির মধ্যে ২৪,৮৪১, সেখানে আরারিয়ার গ্রামাঞ্চলে ইন্দিরা আবাসের সংখ্যা দেখা গেছে সমীক্ষায় অন্তর্গত ৩,৭০৮টির মধ্যে ৬৩২, পূর্ণিয়ায় ৩,৫১৬-র মধ্যে ৬২৭ এবং জামুইতে ৬৬২-র মধ্যে ৩৮। পাটনাতে আবার আধা-নির্মিত আবাসের সংখ্যাও অনেক বেশি দেখা গেছে—২৪,৮৪১টির মধ্যে ১৫,৫৭৪।

১৩। শহরাঞ্চলে ৬,৬৩৪টি পরিবারের মধ্যে চালানো সমীক্ষা থেকে যে ছবিটা বেরিয়ে আসে তার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের ছবির ব্যাপক মিল। নগরায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিহার দেশের সবচেয়ে পশ্চাদপদ জেলাগুলোর অন্যতম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নগরায়নের ধারা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শহর/নগরগুলোতে এবং নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থায় সরকারি বিনিয়োগ বাড়েনি; দ্বিতীয়ত, নগরায়নের যে মডেল গ্রহণ করা হচ্ছে, দরিদ্রদের বর্জন ও অবহেলার ওপর ভিত্তি করেই তা রচিত হয়েছে। ফলে, শহর ও নগরগুলোতে বসবাসকারী দরিদ্র জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণী ক্রমবর্ধমানভাবে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন। শহরে বসবাসকারী জনগণের কাছে আবাসন হল সবচেয়ে বড় সমস্যা ঃ সমীক্ষাভুক্ত পরিবারগুলোর মধ্যে ৬২.০৭ শতাংশ থাকেন একটি মাত্র ঘর থাকা বাড়িতে এবং ৪৭.০১ শতাংশ পরিবারের কাছে জমির কোন কাগজ নেই। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত। শহরের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও মাত্র ৪৬.৩৫ শতাংশ পরিবারের বিদ্যুৎ সংযোগ এবং ৩৯.৬৫ শতাংশ পরিবারের শৌচাগার রয়েছে। জনকল্যাণ প্রকল্পগুলো থেকে কোন সুবিধা তাঁরা পান বলে মনে হয় না। মাত্র ৩৯.৭২ শতাংশ পরিবারের বি পি এল তালিকায় নাম রয়েছে এবং মাত্র ৪০.৯৬ শতাংশ পরিবারের রেশন কার্ড রয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠার সামর্থ্য বিহারের শহর ও নগরগুলোর নেই। পরিষেবা ক্ষেত্রের সংকুচিত হয়ে ওঠা এবং চুক্তি-সম্মানদক্ষিণা ব্যবস্থা বলবৎ হওয়ার ফলে মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। বেসরকারি এবং নির্মাণ ক্ষেত্রের সীমিত পরিধিতে বিহারের শহরাঞ্চলের ৩০.১৩ শতাংশ জনগণের কাছে অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে না, কেননা শ্রমিকদের নিরাপত্তা, সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদায়ী কোন আইন নেই। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

- লিবারেশন, ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী এ আই এস এ

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ছাত্র সংসদের নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র, সমতা এবং ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে বুনিয়াদি পরিবর্তনের এক আকাঙ্খা দেখা গেল। আধিপত্যকারী জাতপাত লবি এবং শাসক রাজনৈতিক দলগুলোর সৃষ্ট হিংসা ও আসামাজিক পরিমণ্ডলেই সামনে এল পরিবর্তনের এই আকাঙ্খা। এ আই এস এ-র কমরেড নীলু জয়সওয়াল ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়ী হয়েছেন এবং কমরেড বিদ্যোৎসা মৌর্য আর্টস ফ্যাকাল্টি থেকে পিজি/রিসার্চ স্কলার প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। যুগ্ম-সম্পাদক পদে নির্বাচনে এ আই এস এ-র কমরেড পবন কুমার এ বি ভি পি প্রার্থীর সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দ্বিতীয় হন। এ আই এস এ-র প্রতিদ্বন্দ্বিরা ছাড়া এ আই ডি এস ও-র দুজন প্রার্থীও নির্বাচিত হন—কমরেড অঙ্কুশ দুবে সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে এবং কমরেড ভীম সিং চাণ্ডেল আর্টস ফ্যাকাল্টি থেকে ইউ জি প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন।

এ বি ভি পি তথাকথিত নরেন্দ্র মোদী হাওয়াকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল এবং তারা বড় ধরণের ধাক্কার মুখোমুখি হয়। বাম শক্তিগুলোর এই বিজয়ের সাথে ঢাক পেটানো 'গেরুয়া হাওয়া' উড়ে যায় এবং তারা কেন্দ্রীয় প্যানেলের একটি মাত্র পদে সামান্য ব্যবধানে জিতেছে। প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদকের পদে জিতেছে সমাজবাদী পার্টির ছাত্র শাখা সমাজবাদী ছাত্র পরিষদ।

যে সমস্ত শক্তি এবারের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদের মধ্যে একমাত্র এ আই এস এ-ই সাধারণ ছাত্র এবং সমাজের বঞ্চিত অংশের অধিকারকে নির্বাচনী প্রচারের এক এজেণ্ডা করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ছাত্রদের পড়াশোনার ইস্যুগুলোকে তুলে ধরা ছাড়াও এ আই এস এ সমাজবাদী পার্টি এবং বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলোকে উন্মোচন করতে থাকে। এ বি ভি পি প্রতিনিধিরা যখন মনে করেছিল যে মোদীর নাম করেই তারা জিতে যাবে, এ আই এস এ তখন এই উদ্যোগে সচেষ্ট হয়েছিল যে সাধারণ ছাত্ররা যেন সি এস এ টি, এস এস সি ফলাফল নিয়ে কেলেঙ্কারি, মূল্যবৃদ্ধি, কালো টাকা এবং শিক্ষা পরিমণ্ডল ও সমাজের সাম্প্রদায়িকীকরণের ইস্যুতে এ বি ভি পি-কে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়।

"আজকের দেশব্রতী" দপ্তরে সমস্ত জেলা থেকে নিয়মিত সংবাদ ও প্রতিবেদন পাঠানোর উদ্যোগ বজায় রাখুন। প্রত্যেক সপ্তাহের মঙ্গলবারের মধ্যে যা পাঠানোর পাঠাতে হবে। —সম্পাদকমণ্ডলী

হিন্দুত্ব, সঙ্ঘ পরিবার ও কিছু কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্টের পরবর্তীতে হিন্দু রাষ্ট্রের চিন্তা, হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠার চিন্তা খুব পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এবং একাজে বাবরি মসজিদ ও রামমন্দির প্রসঙ্গকে বেছে নেওয়া হয় যথেষ্ট ধূর্ততার সঙ্গেই। মনে রাখতে হবে, ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ মার্চ তারিখে, দাঙ্গার সময়, 'হিন্দু দাঙ্গাবাজরা' এই মসজিদটির 'ক্ষতিসাধন' করে এবং 'মূল ফারসীতে লেখা ফলকটি নিয়ে যায়'। এর পনেরো বছর পর ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে অর্থাৎ ডিসেম্বরের বাইশ তারিখে গোপনে এবং সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে রামলালার মূর্তি এই মসজিদে ঢুকিয়ে রেখে এসে রামলালার দেখা দেওয়ার গল্প জনসমক্ষে প্রচার করে হিন্দুভাবাবেগকে জাগিয়ে তোলার অপচেষ্টা করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ ২৩ ডিসেম্বর ফৈজাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কে কে নায়ার উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যদের কাছে বেতারবার্তায় জানিয়েছিলেন—*রাত্রিতে যখন মসজিদ জনশূন্য ছিল কয়েকজন হিন্দু মসজিদে মূর্তি রেখে গেছে। ... রাত্রিতে ১৫ জন পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল, কিন্তু কিছুই করেনি বলে মনে হয়।*

ঐ একই দিনে অযোধ্যা থানায় এফ আই আর-এ জানানো হয় যে রাত্রে পঞ্চাশ-ষাট জন লোক তালা ভেঙে কিম্বা দেওয়াল টপকে মূর্তি বসিয়ে এবং দেওয়ালে ছবি এঁকে রেখে চলে গিয়েছে। আর এহেন সাম্প্রদায়িক চিন্তাপ্রসূত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজকে আর এস এস-এর মুখপত্রে পরবর্তীকালেও প্রশংসা এবং সমর্থন করে লেখা হয়েছিল—১৯৪৯-এর ২৩ ডিসেম্বর সকালে 'অলৌকিকভাবে রামসীতার মূর্তি আবির্ভূত হয় ঐ মসজিদের অভ্যন্তরে 'জন্মস্থানের' জায়গায়!

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর যেদিন রাত্রের অন্ধকারে মসজিদের ভেতরে রামলালার মূর্তি রেখে এসে মন্দির-মসজিদ বিবাদকে অসমাধেয় জায়গায় নিয়ে যাওয়ার উগ্র হিন্দুত্ববাদী চক্রান্তের বীজ বপন করা হয়, তার মাত্র দুবছর আগে ১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি আর এস এস কর্মী নাথুরাম গডসের গুলিতে খুন হন গান্ধীজী। এর ফলশ্রুতিতে আর এস এস-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এরপর যখন গোলওয়ালকর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং আটক সহকর্মীদের মুক্তির দাবি করেন, তখন ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে সর্দার প্যাটেল আর এস এস-এর কর্মধারার প্রতি নিন্দাবাদ করে গোলওয়ালকরকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাঁর মূল অপরিসীম। এই চিঠিতে প্যাটেল লিখেছিলেন—*তাদের নিরপরাধ স্ত্রীলোক, পুরুষ, শিশুদের বদলার আগুনে ঠেলে দেওয়া অন্য কথা। ... আর এস এস-এর যুবকরা বদলা নেওয়ার মানসিকতা থেকে মুসলিমদের উপর হামলা করেছে। ... তাদের ভাষণে ভরা থাকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ। হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য বিষোদগার কখনই জরুরী নয়।*

এই 'বিষোদগার'-এর পরিণতি হিসেবে গান্ধী-হত্যার ঘটনা ঘটেছিল। শুধু তাই নয়, 'গান্ধি-হত্যার আনন্দে' আর এস এস-এর কর্মকর্তারা 'মিষ্টি বিতরণ' করেছিলেন! আর এই বিকৃত বীভৎস উল্লাস ১৯৪৯-এর ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদের ভেতর রামলালার মূর্তি বসিয়ে যে সাম্প্রদায়িক চেতনার সুদূরপ্রসারী বীজ বপন করেছিল, ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বরের ঘটনা ও দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে হিন্দুত্বের ঘোষণায় তা ফ্যাসিস্ত চরিত্রের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিল। বাইরে থেকে প্রবিষ্ট রামলালার মূর্তি মসজিদ থেকে সরাবার ব্যবস্থার কথা বলা সত্ত্বেও উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ মূর্তি সরাবার কোনও ব্যবস্থাই নেননি। এরপর জানুয়ারি ১৬, ১৯৫০ তারিখে গোপাল সিং বিশারদ নামক জনৈক ব্যক্তি এই মূর্তি সরানোর বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ ও মূর্তিপূজার অধিকার চান আদালতের কাছে। এর ফলশ্রুতিতে মসজিদে তালাচাবি দেওয়া হয় এবং বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন হিসেবে থেকে যায়। এর প্রায় ছত্রিশ বছর পর রাজীব গান্ধীর উদ্যোগে ফৈজাবাদের জেলা জজ মসজিদের তালা খোলার অনুমতি দেন। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এ সম্পর্কে যা লেখা হয় তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—*বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শীর্ষস্থানীয় নেতারা বলেছিলেন যে রাজীব গান্ধী সুনিশ্চিতভাবেই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে শিবরাত্রির আগেই (অর্থাৎ জানুয়ারি ৮, ১৯৮৬-র আগেই) ভক্তদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।*

রাজীব গান্ধী তাঁর কথা রেখেছিলেন এবং এই মসজিদ ধ্বংসের মতো অমানবিক ফ্যাসিস্ত কাজ সমাধার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ মুসলমানের মসজিদ ভেঙে রাধারামাধবের মন্দির গড়ার যে উদগ্র আকাঙ্খা ভাষা পেয়েছিল, অবশেষে সেই আকাঙ্খার চরিতার্থতা ঘটেছিল বিগত শতাব্দির নব্বইয়ের দশকের প্রারম্ভে, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে! এই জঘন্য কাজকে সংঘ পরিবার কোনও দুঃখজনক কাজ বলে মানতে রাজি হয়নি। এই ঘটনা ঘটার মাত্র এগারো দিনের মাথায় দিল্লীর 'অবজারভার' পত্রিকায় প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে প্রমোদ মহাজন সরাসরি বলেছিলেন যে 'নিঃসন্দেহে' তাঁরা তাঁদের 'লক্ষ্যসাধন' করতে পেরেছেন, মসজিদটি 'নিশ্চিহ্ন' হওয়ায় তাঁরা আদৌ 'দুঃখিত বা ব্যথিত' নন! লক্ষণীয় যে, মসজিদ ধ্বংসকরণকে তাঁরা নির্দ্বিধায় তাঁদের 'লক্ষ্যসাধন' বলে আখ্যাত করেছিলেন, আর স্বাভাবিকভাবেই এই 'লক্ষ্যসাধন'-এর সাফল্যে দুঃখপ্রকাশের প্রশ্নই ওঠে না! হিন্দুত্বের জাগরণের জন্যে, হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে আর এস এস নিয়ন্ত্রিত সংঘ পরিবার যে ফ্যাসিস্ত হয়ে উঠতে পারে তা নিজেরাই সদর্পে স্বীকার করেছিলেন। ফ্যাসিস্ত হিটলারের ইহুদি নিধন ও ইহুদি খেদানোর ঘটনাকে এঁরা শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবেই গণ্য করেছিলেন। আর স্বভাবতই এই শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে এদেশে কথিত 'বিদেশি' মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিটলারি পদ্ধতি প্রয়োগের মানসিকতাকে এই সংঘ শক্তি সযত্নে লালন করে থাকে। ফ্যাসিবাদের মাহাত্ম্য প্রচার করতে গিয়ে আর এস এস নেতা গোলওয়ালকর বিরানব্বইয়ের কয়েক বছর আগে প্রকাশ্যেই বলেছিলেন যে জাতি ও সংস্কৃতিকে 'পবিত্র' রাখার জন্যে হিটলারের দেশকে ইহুদিহীন করার প্রক্রিয়াকে তিনি 'হিন্দুস্তানের মানুষদের কাছে' একটি 'লাভজনক শিক্ষা' বলে উল্লেখ করেছিলেন। হিটলারের যে কাজকে সংঘ নেতা 'লাভজনক শিক্ষা' বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, সেই কাজের জন্যে পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে ও বন্দিশিবিরে প্রাণ দিতে হয়েছিল। আর এই পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদির মধ্যে এগারো লক্ষ ইহুদির বয়েস ছিল তিন বছরের নিচে! হিটলারের এহেন ফ্যাসিস্ত নিধনযজ্ঞকে সংঘ নেতা শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই হিন্দুরাষ্ট্রের প্রবক্তারা সরাসরি একথা ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেননি যে, *অনুকূল পরিবেশ থাকলে আর এস এস হবে, যা হয়েছিল জার্মানিতে হিটলার-ইয়ুথ বা ইতালিতে ফ্যাসিস্ত যুব সংঘ। শৃঙ্খলা, সংগঠিত কেন্দ্রিকতা ও সংঘবদ্ধ চেতনার নাম যদি হয় ফ্যাসিবাদ, তবে আর এস এস নিজেকে ফ্যাসিস্ত বলতে লজ্জিত নয়।*

স্বভাবতই নিজেকে ফ্যাসিস্ত বলতে লজ্জিত না হওয়া সংঘ পরিবারের নিয়ন্ত্রক এই সংগঠনটি যখন দেশজুড়ে উগ্র হিন্দু ধর্মান্ধতাকে পুঁজি করে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই তিন লক্ষের (১৯৯৩-এর গোড়ার দিককার হিসেব) মতো সদস্য-সমর্থক গড়ে তুলতে সমর্থ হয়, তখন নিঃসন্দেহে তা দুর্ভাবনার কারণ হয়ে ওঠে। আত্ম সন্তুষ্টিতে ভোগা পশ্চিমবঙ্গের বিগত বামফ্রন্টের নিয়ন্ত্রক বড়দাদা পার্টিটি আর পাঁচটা বুর্জোয়া সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে বেওসা-করা রাজনৈতিক দলের মতো হয়ে পড়ায়, সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতাকে মূলগতভাবে একটা নন-ইস্যু হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত থেকে কার্যত পশ্চিমবাংলায় ধর্মীয় উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের শক্তি সঞ্চয়ে সুযোগদান করেছিল। আর এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল বিরানব্বইয়ের ৬ ডিসেম্বরের ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গ কয়েকদিনের জন্যে সমাজবিরোধীদের হাতের মুঠোয় চলে যাওয়ার ঘটনায়। এখন তো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আর এস এস পোষিত বিজেপি মোদীর নেতৃত্বে দিল্লীর ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। আগামী বিধানসভার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার দখল নিতে তারা যতই স্বপ্নকাতর হচ্ছে, ততই নতুন নতুন পরিকল্পনায় সাম্প্রদায়িক জিগিরকে তারা সামনে নিয়ে আসছে। বামফ্রন্টের দীর্ঘ অপশাসনে অতিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধী একটি দক্ষিণপন্থী শক্তিকে ক্ষমতাসীন করেছিল। মাত্র সাড়ে তিনবছরেই মানুষের মোহ অনেকটাই চিড় খেয়েছে। দিল্লীর মসনদে আসীন হওয়ার পর এবং পশ্চিমবঙ্গে একটি বিধানসভার আসন জেতার ফলশ্রুতিতে আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে তারা একদিকে যেমন তৃণমূলবিরোধী জনমানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগাতে চাইছে, তেমনই একইসঙ্গে তাদের সাম্প্রদায়িক অ্যাজেণ্ডাকে কার্যকরী করতে অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি খোদ পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু মুসলিম সমাজবিরোধীর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রমাণ মেলায় সংখ্যালঘু সমগ্র মুসলিম সমাজকেই সন্ত্রাসবাদী হিসেবে আখ্যাত করে তাদের বিরুদ্ধে হিন্দু ভাবাবেগকে উস্কানি দিয়ে তাদের হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে সংঘ পরিবার।

মনে রাখতে হবে সমাজবিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদীদের কোনও আলাদা ধর্ম, বর্ণ ও জাত হয় না। সমাজবিরোধী সমাজবিরোধীই, সন্ত্রাসবাদী সন্ত্রাসবাদীই। স্বভাবতই এই সমাজবিরোধী বা সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম বা বর্ণের মানুষ বা জনসমষ্টিকে একীভূত করে ফেলা ঠিক নয়। অথচ ঠিক এই কাজই তাদের অ্যাজেণ্ডামাফিক করে চলেছে সংঘ পরিবার। তারা বিভিন্ন দেশে মুসলিম সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কাজকর্মের সঙ্গে এদেশের কিছু সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মকে সার্বিকভাবে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে একীভূত করে দেশের সমগ্র মুসলিম জনজাতিকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে আখ্যাত করে তাদের বিরুদ্ধে অমুসলিম তথা নির্দিষ্টভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িক মননকে বিষিয়ে তুলে জাতীয় জীবনকে বিপন্ন করে তোলার ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে তাদের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার পথে পা বাড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও গবেষক আশিস নন্দী একবার আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রবন্ধে আশিস নন্দী জানিয়েছিলেন যে তিনি 'এক বিশুদ্ধ আগাপাশতলা ফ্যাসিস্তের সাক্ষাৎ' পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—*আমার এখনও মনে আছে কী শীতল, মাপজোক করে কণ্ঠস্বরে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে এক বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি মুসলমান একজন সন্দেহভাজন দেশদ্রোহী এবং সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদী।*

সেই নরেন্দ্র মোদীই আজ দেশের প্রধানমন্ত্রীত্বের মসনদে বসে দেশ শাসনের দায়িত্ব নিয়েছেন। স্বভাবতই এহেন একজন 'আগাপাশতলা ফ্যাসিস্ত' ফ্যাসিস্ত অ্যাজেণ্ডা অনুযায়ী কাজ করবেন, এরকম ধারণার অবকাশ থেকেই যায়। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ডোনাল্ড স্মিথ তাঁর 'ইণ্ডিয়া অ্যাজ আ সেক্যুলার স্টেট' গ্রন্থে বলেছিলেন—*সামরিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া, বর্ণ-সংস্কৃতির ওপর জোর দেওয়া, ধর্মান্ধতার ভিত্তিতে উগ্র জাতিয়তাবাদ, অতীতের ভালোত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ, জাতীয় ঐক্যের ওপর জোর দেওয়া, সংখ্যালঘু জনসাধারণকে বাদ দিয়ে জাতির ধারণা নির্মাণ—আর এস এস-এর ইত্যাকার বৈশিষ্ট্যগুলো ইউরোপের ফ্যাসিস্ত আন্দোলনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।* আজ থেকে একান্ন বছর আগের বলা এই কথাগুলো আজ আমরা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করছি। এই উপলব্ধিই যদি অনতিবিলম্বে প্রতিরোধ আন্দোলনে চারিয়ে দেওয়া না যায় তবে তা হবে মনুষ্যত্বের প্রতি ক্ষমাহীন অপরাধ। (সমাপ্ত)

- অশোক চট্টোপাধ্যায়

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় ৬ পাতায় ''হিন্দুত্ব, সংঘ পরিবার ও কিছু কথা'' শিরোনামে প্রবন্ধের ২-৩ কলমের সংযোগ লাইনগুলোতে পড়তে হবে '... এখানে 'রাম' এর অবতার হিসেবে এঁরা বিদেশী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। পরাধীন জাতির প্রতীক হিসেবে 'রাম'কে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। আর আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথমে এসে হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় ফ্যীসস্তরা 'রাম'কে ব্যবহার করতে চাইছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে!'

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লাভ জেহাদ' অতিকথার বিরুদ্ধে আইসা'র সভা পন্ড এবিভিপি-র হামলায়

গত ১৫ নভেম্বর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসা সাম্প্রদায়িক 'লাভ জেহাদ' বিরোধী এক সভার আয়োজন করেছিল, ঐ সভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির জাতীয় স্তরের সম্পাদক কবিতা কৃষ্ণান। আগে থাকতে ঐ সভার অনুমতি নেওয়া ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিস্কার বলে দিয়েছিলেন সভা হওয়ার ব্যাপারে ''কোন আপত্তি নেই''। আইসা উত্তরপ্রদেশে ও অন্যত্র ধারাবাহিকভাবে এবিভিপি-র সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, হিংসা ও দাঙ্গাবাজির বিরুদ্ধে, বিশেষ করে 'লাভ জেহাদ'-এর সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে এক সাহসী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এই অভিযান লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের থেকে ভালো সাড়াও পাচ্ছে। আইসা-র এই প্রতিস্পর্ধী অভিযান দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে সভার আগের দিন থেকে এবিভিপি প্রচার করতে থাকে যে তারা সভা করতে দেবে না। তারা এমনকি হুমকি দিতে থাকে আইসা কর্মীদের। তারা উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে সভা অনুমোদন বাতিল করার জন্য। যাই হোক, আইসা স্থির থাকে সভা করার।

তারপরে সভার দিন যেটা দেখা গেল সেটা পুরোপুরি পিতৃতান্ত্রিক হিংসা, গুন্ডামী এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর ফ্যাসিস্ত আক্রমণ। এবিভিপি-র গুন্ডারা আইসার সভার জায়গায় হামলা চালাতে ঢুকে পড়ে, তারা আইসার ব্যানার, ফ্ল্যাগ সব ছিঁড়ে দেয়, বক্তব্য রাখতে বাধা দিতে শুরু করে, তারা আইসা কর্মীদের বলতে থাকে কবিতা

সাতের পাতায় দেখুন

৬ ডিসেম্বর ঃ বাইশ বছর আগের এক দিনকে ঘিরে কয়েকটি কথা

১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ভাঙার দিনটি ছিল ভারতের রাজনীতিতে এক জলবিভাজিকা। ওই দিনটির পর থেকে কোনকিছুই আর আগের মত থাকেনি। কিন্তু তার পরেও সংঘ পরিবারের বিপদ বাংলার মানুষের কাছে ছিল যেন এক দূরের বস্তু। ৬ তারিখের দিনটি আগেও এসেছে, চলেও গেছে। কিন্তু ঘাড়ের কাছে সংঘীদের নিঃশ্বাস আগে আমরা তেমন অনুভব করিনি। এখন দাঙ্গার কারিগর অমিত শাহ্ এসে হুঙ্কার দিয়ে যাচ্ছে, আর বিজেপি সাধারণ মানুষের সামনে বিকল্প হিসেবে উঠে আসতে চাইছে—এমন দিনের কথা কেউ হয়তো ক'বছর আগে স্বপ্নেও ভাবেন নি।

৬ ডিসেম্বর নিয়ে আলোচনা হলে তার আগের দিনগুলো ভুলে যাওয়া সম্ভব কি? ১৯৮৪ সালে শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টকে অগ্রাহ্য করার যে নীতি রাজীব গান্ধী নিয়েছিলেন তার ফলেই সংঘীরা তাদের রাজনীতির যৌক্তিকতা নতুন করে নির্মাণের সুযোগ পায়। আর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার অবকাশ জোটে রাম মন্দিরের দরজা হাট করে খুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। রাম মন্দিরের তালা খুলে দেওয়াটা ছিল ভারতবর্ষে খুল্লামখুল্লা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দরজাও খুলে দেওয়া। আর খুলে দেওয়ার ফলে যখন বাবরি মসজিদকে দিনের আলোয়, টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে উল্লাসের সাথে ভাঙা হচ্ছে বিবেককে সচকিত করে দিয়ে তখন ভারতের তখ্তে নরসিংহ রাও। কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তিনি? নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকা ছাড়া? কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ মুলায়ম সিং যাদব? কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িকতা আর বিজেপির আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি একে অপরকে পুষ্ট করেছে। তার ফলই ছিল ২২ বছর আগের দিনটি।

সংঘ পরিবার মাঝের ২২টি বছর ধরে বারবার গিরগিটির মতো নিজেকে পাল্টেছে। রাম মন্দির আন্দোলনের সময়ের স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অর্থনীতি বহুদিন আগেই পরিত্যক্ত। ২০০২ সাল আসতে আসতে রাম মন্দির নিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করে গণহিস্টিরিয়া তৈরির প্রয়োজন শেষ। দলিত আর আদিবাসীদের ব্যবহার করে গুজরাতে বরং আগ্রাসী পুরুষতান্ত্রিক হিন্দুত্ব সরাসরি তার 'অপরের' গণ-নিধনের মধ্যে দিয়ে দলিত-আদিবাসী আর উচ্চবর্ণের এক অদ্ভুত ককটেল জোট নির্মাণ করলো। গুজরাতের রাজ্য রাজনীতিতে যার 'সুফল' সংঘ পরিবার এখনও পেয়ে আসছে।

কিন্তু শেষ লোকসভা নির্বাচনের আগে হিন্দুত্বের কর্পোরেট মুখটি ক্রমশ আরও স্পষ্ট হল। ফ্যাসিবাদের দক্ষিণপন্থী তিনটি ধারা একে অপরকে পুষ্ট করলো। সামাজিক রক্ষণশীলতার ধারা হিসেবে খাপ পঞ্চায়েত, লাভ জেহাদের ধারণা উত্তরপ্রদেশে সামাজিক মেরুকরণ ঘটালো সার্জিক্যাল দক্ষতায়। অন্যদিকে সংখ্যাগুরু, সাম্প্রদায়িকতার ধারাটি আগের মত গণহত্যা বা দেশব্যাপী ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির বদলে বেছে নিল 'স্মল ইজ বিউটিফুলের' ধারণাকে। মুজফ্ফরনগর বা অসমের মধ্যে দাঙ্গাকে সীমাবদ্ধ রাখার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী লাভকে নিশ্চিত করা হল এবং আগ্রাসীভাবে সামনে এল 'উন্নয়ন' আর 'আচ্ছে দিন'-এর স্বপ্ন। যার অর্থ নির্মাণের দায় ছেড়ে দেওয়া হল ভোটারদের হাতে। যে যার মত ভালো দিনের কথা ভেবে নিতে পারে। কিন্তু প্রথম দুই রক্ষণশীল ধারা ছিল এই ভালো দিনের পেছনের মূল কর্পোরেট অ্যাজেণ্ডাকে বৈধতা দেওয়ার রাজনীতি মাত্র। দক্ষিণপন্থী রাজনীতির তৃতীয় ধারাটি তখনই বৈধতা পেতে পারে যখন মেহনতি মানুষের লড়াই করার ক্ষমতার জায়গাতেই আঘাত করা যেতে পারে। আর ক্ষমতায় আসার পর কালো টাকা ফেরানোর গল্প হাওয়ায় উবে গেলেও, মূল্যবৃদ্ধি কমানোর প্রতিশ্রুতি ছেঁড়া কাগজের ফানুস হয়ে গেলেও, যে দুই শ্রেণীর ওপর আঘাত নামানো হল তারা গ্রামীণ ও শহুরে শ্রেণী। এন আর ই জি এ-র ওপর আঘাত নামানো মানে শুধু গ্রামাঞ্চলে কাজের সুযোগ কমে যাওয়াই নয়, গ্রামীণ ক্ষেতমজুরদের কৃষিক্ষেত্রে মজুরির দর-কষাকষির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানকে লঘু করে দেওয়া। আর অন্যদিকে শ্রম আইনকে সংস্কারের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত হওয়ার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হল।

হিন্দুত্বের নতুন মুখের বিরুদ্ধে লড়তে হলে তাই তার তিনটি ধারাকেই চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু মাত্র 'রাম রহিম না জুদা করো ভাই' গেয়ে আর বাম রাজনীতি চলতে পারে না। কোনও একটি প্রতিক্রিয়ার ধারাকে নজর-আন্দাজ করার অর্থ অন্য প্রতিক্রিয়ার ধারাকে শক্তিশালী করা।

বিজেপি-আর এস এস-এর রাজনীতি কোনকালেই নিছক ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টির রাজনীতি নয়। সেটা কখনও তার মুখোশ। কখনও সাইড ডিশ। আসল লক্ষ্য অন্যত্র। যে কোনও ফ্যাসিবাদী/ফ্যাসিবাদমুখী রাজনীতির মতোই তার লক্ষ্য বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকেজো করে দেওয়ার। গোলওয়ালকার সাধে ১৯৩৮ সালে 'উই অর আওয়ার নেশানহুড ডিফাইনড' গ্রন্থে হিটলার পুজো করেননি। সাধে আর এস এস-এর ঘোষিত লক্ষ্য হিন্দুরাষ্ট্র নয়। ফ্যাসিবাদের সাথে লড়াই করলে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নটিকে কেন্দ্রীয় স্তরে রাখার দরকার শুধু রণ-কৌশলের দিক থেকে নয়। রণনীতির দিক থেকেও। তাই আমাদের রাজ্যে খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণকে ঘিরে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এন আই এ-র জন্য হাঁক পেরে পেরে আর যাই হোক এই লড়াইতে জেতা যাবে না।

গণতন্ত্রের প্রশ্নটিকে বাদ দিয়ে সংঘীদের আটকে দেওয়ার 'কৌশল' কি হতে পারে তা আমরা আমাদের রাজ্যে তৃণমূলের প্রচারের মধ্যে দিয়ে দেখছি। তৃণমূল দলটির কাছে যদিও এই প্রশ্নের উত্তর নেই যে ১৯৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রথম এম এল-এ কাদের হাত ধরে এসেছিল? বা ২০০২ সালে গুজরাত দাঙ্গার পর লোকসভায় এন ডি এ-র বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতে কেন মমতা ব্যানার্জী দলীয় হুইপ জারি করেছিলেন? বিজেপির সাথে দীর্ঘদিন ঘর করে আসার পর বর্তমান সময়ে তার কাছ থেকে বিজেপি বিরোধিতার সুবিধাবাদে বিজেপিরই হাত শক্ত হচ্ছে মাত্র।

আমাদের রাজ্যে সার্জিক্যাল দাঙ্গা এখনও হয়নি। হয়তো তা তোলা আছে পরবর্তী কোন সময়ের জন্য। হিন্দু সংহতির মতো সংঘ পরিবারের ছোটো শরিকরা 'লাভ জেহাদের' বঙ্গীয় সংস্করণ চালু করার চেষ্টা করলেও তা এখনও রাজনীতির মূলমঞ্চে ব্যবহৃত হয়নি। এখানে বড় শহরের আপওয়ার্ডলি মোবাইল মধ্যবিত্ত অংশের বাইরে উন্নয়নের 'আচ্ছে দিন'-এর গল্প খুব একটা ফিরি করা হচ্ছে তাও নয়। এক আপাদমস্তক অগণতান্ত্রিক রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ন্যায্য ক্ষোভকে ব্যবহার করার চেষ্টা চালানো সহ খাগড়াগড়কে কেন্দ্র করে ইসলামোফোবিয়ার এক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে রাজ্য জুড়ে। আউটলুকের এক প্রবন্ধেই প্রকাশ পেয়েছে খাগড়াগড় নিয়ে অতিকথাগুলোর খড়ের পা। আমাদের নিজেদের তথ্যানুসন্ধানেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তের একাধিক গুরুতর ফাঁক উঠে এসেছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? মিডিয়া আর সাধারণ মানুষের কমনসেন্সের অসামান্য চোলাই বর্তমান সংঘ পরিবারের হাতের সব থেকে বড় অস্ত্র। আর হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভোটকে নিজের দিকে টানার এই অংশের মানুষের মনে সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ একই সাথে জাগিয়ে তোলার সুচতুর কৌশল বিজেপির বর্তমান রাজনীতির ফোকাসের আরেক দিক। এই প্রেক্ষিতে ইসলামোফোবিয়াকে নির্মম নিরলস আঘাত করার জরুরী কাজ বাদ দিলে সংঘীদের গেমপ্ল্যানই বিজয়ী হবে।

আসলে সংঘের নানা মুখ আর মুখোশের সামনে দাঁড়িয়ে হারিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষদের সমস্যার কথাগুলো। চা-বাগানের মৃত্যুমিছিল, একের পর এক চটকলের বন্ধ হয়ে যাওয়া, পরিবহন শ্রমিকদের বেহাল দশা, মূল্যবৃদ্ধি, শ্রম আইন সংস্কার সবই খবরের কাগজের ছ'য়ের পাতার খবর। সংখ্যালঘু পরিচিতির ওপর আঘাতের প্রশ্নটিকে নজর-আন্দাজ না করেই দরকার যে ইস্যুগুলো সংঘীরা আমাদের ভুলিয়ে দিতে চায় সেগুলোকে না ভোলা। ৬ তারিখ উপলক্ষে এই চেনা কথাগুলোই আরেকবার নিজেদের মনে করা/করিয়ে দেওয়া জরুরী হয়ে পড়ছে। হয়তো ভবিষ্যতেও বার বার পড়বে।

- দ্বৈপায়ন ব্যানার্জী

এ আই সি সি টি ইউ সমাবেশের বার্তা ...

একের পাতার পর

সংগঠিত ক্ষেত্রে রেল শ্রমিকরা বাধ্য হয়েই ধর্মঘটের পথে পা বাড়াচ্ছেন। একদিকে মোদী সরকারের চাপিয়ে দেওয়া অর্থনৈতিক সন্ত্রাস ও সমাজবিরোধী রাজ্য সরকারের যৌথ সাঁড়াশি আক্রমণ নামছে।

চটকল শ্রমিক নেতা ওমপ্রকাশ রাজভর বলেন, ন্যূনতম মজুরি, পেনশন, পি এফ এবং জুটি প্যাকেজিংয়ের দাবিতে চটকল শ্রমিকদের লড়াই ও ধর্মঘটের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার দমননীতি গ্রহণ করছে। নির্মাণ শ্রমিক আন্দোলনের নেতা কিশোর সরকার বলেন, নির্মাণ শিল্পে বহুজাতিক লগ্নীকারীরা এখন নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুনাফা বুঝে নিয়ে দেশত্যাগ করতে পারবে কোনরকম দায়বদ্ধতা ছাড়াই। সরকার লগ্নীকারী সংস্থাগুলো থেকে ১ শতাংশ হারে সেস আদায় করে—যা দিয়ে নির্মাণ মজদুরদের সামাজিক সুরক্ষার তহবিল গঠিত হয়। শ্রমিকদের দাবি এই সেস অন্তত ৫ শতাংশ হারে লাগু করা হোক, সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পে নিযুক্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার (পেনশন এবং পি এফ ফাণ্ড গঠন ইত্যাদি) তহবিল গঠন করা হোক।

পার্থ ঘোষ বলেন, কেন্দ্রের মোদী সরকার 'সুদিনের' কথা বলে সাধারণ মানুষের জন্য চরম দুর্দিন নিয়ে এসেছে। জনহিতকর কোন কাজ তারা করেনি বরং বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক শক্তি দাঙ্গা বাঁধিয়ে ১০০-র বেশী মানুষকে হত্যা করেছে। শ্রমিকরাই পারেন একজোট হয়ে এই মেরুকরণ ও বিভেদের রাজনীতিকে পরাস্ত করতে, ১৯৪৬ সালে যা করেছিলেন কর্পোরেশনের সাফাই মজদুর ইউনিয়ন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারও প্রান্তিক কৃষক ও কৃষিমজুরদের জন্য কোন সুদিন নিয়ে আসতে পারেনি, বরং কর্পোরেট লুটেরাদের স্বার্থে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিধানসভায় নিয়ে আসছে কৃষিপণ্য বিপণন সংশোধনী বিল যা খোলাবাজার অর্থনীতিকে আরও জায়গা করে দেবে, দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দেবে কৃষিজীবীদের। এরাজ্যে শ্রমিকশ্রেণী, সাধারণ মানুষ, সাংবাদিকদের জন্য কোন গণতন্ত্র নেই, গণতন্ত্র আছে লুম্পেনদের জন্য।

মীনা পাল ৪৬তম জাতীয় শ্রম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়িকর্মী ও রন্ধনকর্মীদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দান ও তাদের জন্য সান্মানিক ভাতার পরিবর্তে মাসিক মজুরি এবং সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে ঐ সম্মেলনে। এরাজ্যে মিড-ডে-মিল রন্ধনকর্মীদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলার জন্য ৮ জনের পরিবর্তে ৪০ জন পিছু মাত্র ১ জন রন্ধনকর্মী নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দিবাকর ভট্টাচার্য বলেন, নির্মাণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য গঠিত তহবিলে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে যাচ্ছে। সমস্ত দাবিগুলোকে নিয়ে এক দাবিসনদ পেশ করা হবে উপযুক্ত আধিকারিকদের কাছে। সভার সভাপতি নবেন্দু দাশগুপ্ত সভা শেষ করার আগে ঘোষণা করেন, ১০ ডিসেম্বর এ আই সি সি টি ইউ-র এক প্রতিনিধি দল শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে ডেপুটেশনে মিলিত হবেন। তাদের সঙ্গে থাকবে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র যার সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য পেশ করা হবে শ্রমমন্ত্রীর কাছে।

উপস্থিত শ্রমজীবীদের লড়াকু মেজাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের নীতীশ রায়, বাবুনী মজুমদার, প্রদীপ সরকার প্রমুখ। আগামীদিনে জোর লড়াইয়ের বার্তা নিয়ে শ্রমজীবী মানুষেরা ফিরে যান।

- জ্যোতি ভট্টাচার্য

... এবিভিপি-র হামলায়

ছয়ের পাতার পর

কৃষ্ণানের মতন 'মিথ্যেবাদী' ও 'অনৈতিক' বক্তাকে মতামত রাখতে দেবে না। তারা দাবি করতে থাকে 'লাভ জেহাদ' বিরোধী কোনও সভা করতে দেবে না, কেননা তাদের মতে এই বিরোধিতার মতামত ''ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী''। এবিভিপিওয়ালারা উপস্থিত সভার উদ্যোক্তা ছাত্রী ও মহিলা কর্মীদের উদ্দেশে হুমকি দিতে থাকে, কুৎসিত মন্তব্য করতে থাকে। বহু ছাত্রী বলেন, এবিভিপি-র ছেলেরা তাদের ভয় দেখায়। তারা শ্লোগান তোলে হুমকি দিতে, ''দেশ হ্যায় পুকারতা, পুকারতি হ্যায় ভারতী; খুন সে তিলক করো, গোলিয়োঁ সে আরতি''। ওদের সঙ্গে একজনও ছাত্রী ছিল না। ওদের একজন চীৎকার করতে থাকে এই বলে যে, খাপ পঞ্চায়েত হমারা সিনা গরব সে উঁচা করতি হ্যায়, আপ উনকে খিলাফ বোল নহি সকতি'। এবিভিপির ছেলেরা আইসা নেতৃত্ব ও কমরেড কবিতা কৃষ্ণানকে হেনস্থা করার চেষ্টা চালায়।

সভা পন্ড হয়ে যাওয়ার পর আইসা ফ্যাসিস্ট হামলা ও হিংসার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে এক প্রতিবাদ মিছিল বের করে। বহু সাধারণ ছাত্রী আইসার প্রতিবাদকে সমর্থন জানায়, তারা উপরন্তু বলে যে, সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নৃত্য প্রতিযোগিতা সংগঠিত হয়েছিল, সেখানে যেসব মেয়েরা নাচ করছিল তাদের দিকে ছাত্ররা পয়সা আর ফুল ছুঁড়ছিল। বহু ছাত্রী অভিযোগ করে এবিভিপি পিতৃতান্ত্রিক'সংস্কৃতি'র নোংরা ইঙ্গিত করে, তারা এক শান্তিপূর্ণ সভাও পন্ড করল।

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
ইংরাজী সাপ্তাহিক ''আপডেট''
গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

সি পি আই (এম এল)
কেন্দ্রীয় মুখপত্র (মাসিক)
''লিবারেশন''
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫০ টাকা

বদলে যাওয়া গ্রাম ঃ দেখতে হবে খোলা চোখে

গঞ্জের চায়ের দোকানে দেশের হালহকিকত নিয়ে বৈঠকি আড্ডার মধ্যে ধনী-দরিদ্রের আর্থিক-সামাজিক ব্যবধান কী পরিমাণ বেড়ে চলেছে তা নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করছিলাম। বছর চল্লিশের এক শিক্ষিত যুবক রীতিমত ধমকের সুরে বলে উঠল, ''আপনাদের বামপন্থীদের সেই একঘেয়ে সেকেলে কথাবার্তা। দেশ যে গত পঞ্চাশ বছরে কতখানি বদলে গেছে সেদিকে ফিরেও না তাকিয়ে এখনও সেই সলিল চৌধুরী-সুকান্ত ভট্টাচার্যদের নিয়ে পড়ে আছেন। 'জান কবুল আর, মান কবুল, আর দেব না আর দেব না রক্তে রোয়া ধান।' ছাড়ুন তো, এখন আর জোতদারের কাছারি বাড়ীতে বেঁধে রাখার দিন নেই। জোতদারই বরং ভাগের ধানের জন্যে চাষীর বাড়ী হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। আমি পাল্টা তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করতে সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ''আপনারা অনেক বলেছেন, এখন আমাদেরটা শুনুন। সুকান্ত লিখেছিলেন, 'আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়। সে যুগে যা হয়েছিল, এখন তা আর হয় না। এখন কোন গরিব না খেয়ে থাকে না। তবু আপনারা গলা কাঁপিয়ে, এখনও ঐ কবিতা আবৃত্তি করে যান!''

যুবকটির কথার উত্তর দিইনি। তার কথার কোন সারবত্তা আছে কিনা সেটাই ভাবার চেষ্টা করেছি। ভাদ্রমাসে গাঁয়ের গরিব আর ঘটি-বাটি বন্ধক রেখে চাল জোগাড় করে না। কুখাদ্য না জুটলেও দুবেলা অন্নের অভাব তাদের আর হয় না। ছেলে-বউ নিয়ে তারা যে আর উপোস দিয়ে থাকে না তার পিছনে রয়েছে একগুচ্ছ কারণ। নবীন যুবকটি যাই বলুক না কেন—পঞ্চাশ-ষাটের দশকের জমি দখলের লড়াই, সে সময় থেকে আরও দীর্ঘকাল অবধি মজুরি বৃদ্ধির লড়াই গ্রামের ক্ষেতমজুর-গরিব চাষীদের দুর্গতি ঘোচাতে অনেক সাহায্য করেছে। পাশাপাশি কৃষির উন্নতি, বোরো চাষের ব্যাপক প্রচলন, গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের বিকাশ বা কৃষিকে ঘিরে অন্যান্য পেশার উদ্ভব দারিদ্র্য মোচনে নিদেনপক্ষে পেটের খিদে মেটাতে অনেকটা সহায়ক হয়েছে। এছাড়া রেশনে গরিবদের একটা বড় অংশকে সস্তায় খাদ্য সরবরাহ ও একশ দিনের কাজের প্রকল্প (নরেগা) চালু হওয়াতেও গরিবের ঘরে সম্বৎসর গরম ভাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। যদিও রেশন ব্যবস্থা ও 'নরেগা' গুটিয়ে দেওয়ার সরকারি অভিসন্ধির বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই না চালালে ভাতের থালায় আবার টান পড়বে। আর সেই লড়াইয়ের জন্য সলিল-সুকান্তের পুরানো ভাষা না হোক তাঁদের গভীর আবেগ ও মর্মতেজকে নাকচ করে সাধ্য কার?

দেশ গত পঞ্চাশ বছরে অনেক বদলে গেছে। সত্যিই তো, একথা কে অস্বীকার করবে? ধনিক শ্রেণীর পরিবারগুলোর বৈভবের তুলনায় অতি তুচ্ছ হলেও পরিবর্তনের ছোঁয়া গরিবদের জীবনেও চোখে পড়ার মত উন্নতির ছাপ ফেলেছে। শুধু অনাহারের কষ্ট দূর হওয়া নয়, বেঁচে থাকার জন্য জরুরী প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের বেশ খানিক অগ্রগতি যথেষ্ট নজর কাড়ে। প্রয়োজনের অনেক কিছুই যা বিশ-পঁচিশ বছর আগেও ছিল নাগালের বাইরে এখন সে সব তাদের প্রায় হাতের মুঠোয়। এগিয়ে যাওয়ার প্রতিটি বাঁকে তাদের যুঝতে হয়েছে অনেক বাধা, প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চিন্তা-চেতনা এবং রুচিবোধেও বদল ঘটেছে ভালোমাত্রায়। কোন একটি দাবি আদায়ের জন্য, সরকারি প্রকল্পের সামান্য সুযোগগুলোর একটার ভাগ পাওয়ার জন্য তাদের জোট বাঁধতে হয়েছে, লড়াইয়ের নতুন কৌশল খুঁজে নিতে হয়েছে। বহুক্ষেত্রে আবার পরিস্থিতি তাদের বাধ্য করেছে আপসের পথে সমঝোতার রাস্তায় যেতে। কিন্তু দ্রুত বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতেও তারা লড়াইয়ের রাস্তাতেই টিকে থাকতে চেয়েছে সবসময়। কিন্তু কাণ্ডারীর অভাবে সেই লড়াইয়ের লক্ষ্য স্থির থাকেনি। বৃহত্তর ও সার্বিক দিশার অভাবে সে লড়াই কিছু আংশিক ও সীমাবদ্ধ দাবি বা চাহিদা পূরণের মধ্যেই আটকে থেকেছে। বহু সময়েই গতানুগতিকতার বেড়াজালে বন্দি হয়ে তাদের লড়াকু চরিত্র খণ্ডচেতনায় ভ্রষ্ট হয়েছে।

গ্রাম-গঞ্জের দরিদ্র চাষী-মেহনতী মানুষ তাঁদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে লালঝাণ্ডাকেই বরাবর আঁকড়ে থেকেছে। লালঝাণ্ডার ধারক-বাহকরা রাজ্যে সরকারে এসে পাকাপাকি কায়েম হতে প্রথম প্রথম 'ভাল প্রভুর' মত দাক্ষিণ্য বিলিয়েছে। বিনি লড়াইয়ে ছোট ছোট সব সুবিধা হস্তগত হতে থাকায় গাঁয়ে গরিবদের মধ্যে আন্দোলনের শক্তির থেকেও 'সরকারি নেতা' নির্ভরতা ক্রমেই বড় হয়ে ওঠে। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা তাদের মধ্যে গোড়ার দিকে আর্থিক ও সামাজিক অধিকারবোধ সৃষ্টিতে সক্ষম হলেও পরে তাদের অনেকটাই নেতাদের অনুগ্রহভাজন করে তোলে। একসময়ে সরকারি দলের মাতব্বর ছিলেন কিন্তু এখন ক্ষমতা হারিয়ে যিনি 'কর্মহীন' হয়ে পড়েছেন এমন এক বন্ধু আক্ষেপ করে বলছিলেন, ''যে দিন থেকে পঞ্চায়েতে গাদা গাদা টাকা আসতে লাগল সে দিন থেকেই আমাদের নেতাদের গাড্ডায় পড়া শুরু হল।'' সত্যি সত্যিই পঞ্চায়েতের বাবু হয়ে রিলিফের চালের কিছু অংশ বাজারে পাচার করা, আই আর ডি পি-আই টি ডি পি লোন, এই ভাতা-ঐ ভাতা পাইয়ে দেওয়ার বদলে অল্পসল্প সুবিধা নেওয়া থেকে 'ফুড ফর ওয়ার্কে'র হিসেবে কারচুপির মধ্য দিয়ে সরকারি বাম দলের পার্টি যন্ত্রে যে মরচে ধরার শুরু সেটাই জীর্ণ হতে হতে 'সর্বশিক্ষা'র টাকা, ঢালাই রাস্তার কমিশন ও একশ দিনের কাজে ভুয়ো মাস্টার রোল তৈরীর মাধ্যমে হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ে।

নেতাদের অধঃপতন, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ দেখে তিতিবিরক্ত হলেও গ্রামের গরিবরা কিন্তু শেষ অবধি লালঝাণ্ডা ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। প্রতিবাদ আর আপসের এক মাঝামাঝি রাস্তা বেছে নিয়ে তারা ভরাডুবির থেকে বাঁচতে চেয়েছে। ব্যাপারটা কী রকম? গরিব চাষী, ক্ষেতমজুরদের যে বিরাট অংশ লাল পার্টি বলতে কেবল সি পি এমকেই বুঝত, তাদের অনেকে নেতাদের সবক শেখাতে বা ওয়ার্নিং দিতে সি পি এম ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লকে নাম লেখালো। সি পি এম নেতাদের 'জমিদারি' না মানাটা যদি প্রতিবাদ হয়ে থাকে তাহলে ফরওয়ার্ড ব্লকের মত একটা নড়বড়ে দলে নাম লেখানোটা আপস বৈকি! মোটমাট, অদূরে তৃণমূলের হাতছানি দেখেও সরাসরি লাল শিবির পরিত্যাগ করতে গরিবদের মন চায়নি (লাল-সবুজের পার্থক্যরেখা মুছে যেতে থাকায় জায়গায় জায়গায় গরিবরা তৃণমূলেও নাম লিখিয়েছিল)।

মজুরি, কাজ ও সরকারি প্রকল্পে সুযোগ পাওয়ার দাবিতে লড়াই চলবেই!

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাড়ে তিন বছর গড়িয়ে গেল। এই জমানায় গরিব ক্ষেতমজুররা যে আরও কোণঠাসা হবে তা কারও অজানা ছিল না। জোতদার ধনী ও পুঁজিবাদী কৃষকরা উৎসাহিত হয়ে এই সময় পর্বে যেভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে তাতে নতুন করে জমি দখলের আন্দোলনের এখন কোন প্রশ্নই নেই (বলতে কি ভূমিসংস্কারের অ্যাজেণ্ডাকে বুদ্ধবাবুরাই হিমঘরে পাঠিয়েছিলেন)। সি পি এম তো এখন খুবই নির্জীব। একশ দিনের কাজে বকেয়া মজুরি দীর্ঘদিন পড়ে থাকে। তাই ক্ষেতমজুররা নিজস্ব তাগিদেই স্বাধীনভাবে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে নেমে পড়ছে। গ্রামের ধনী অংশের বা সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজেণ্ডা। কিন্তু চাষের কাজে কর্মসংস্থান তো বছরে তিন মাসও হয় না। তাই 'নরেগা' আইনে কাজের সুযোগ কমানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রচার ও আন্দোলনে গরিবদের বেশী বেশী করে সামিল করা খুবই প্রয়োজন। তৃণমূলের দুর্নীতি, অত্যাচার ও অপশাসনের সুযোগে বিজেপি যে রাজনৈতিক জমি দখল করতে চাইছে তাকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে এই আন্দোলন এক বড় হাতিয়ার। 'দেশে স্বচ্ছলতা এসেছে এবং গরিবের সংখ্যা কমেছে'—এই কথা বলে, ভুয়ো সামাজিক সমীক্ষা চালিয়ে মনমোহন সরকারের দেখানো রাস্তায় মোদী সরকার আরও নির্দয়ভাবে বহু গরিব পরিবারকে খাদ্য ও সরকারি বিভিন্ন সংস্কার প্রকল্পের আওতা থেকে বাদ দিতে চাইছে। একে তো চালু প্রকল্পগুলোতেই নানা ফাঁক ফোকর, তার ওপর প্রকল্পগুলোর অধিকাংশকেই যদি বিজেপি সরকার নতুন মোড়কে আরও কাটছাঁট করে দেয় তাহলে গরিব মেহনতীরা নতুন করে খাদ্যাভাব ও বিবিধ সংকটে পড়ে যাবে। তাই এই সমস্ত বিপদের মোকাবিলায় নানা আলোড়নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ ও প্রশাসনের নানা স্তরে লাগাতার চাপ সৃষ্টি করাটা খুবই আবশ্যক।

এটা ঠিক, সমস্ত সংস্কার কর্মসূচীগুলোকে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার রাতারাতি একসাথে বন্ধ করে দিতে পারে না। প্রলোভন দেখিয়ে শাসক দলের মোড়লরা মানুষকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টার কসুর করবে না। কিন্তু এই মোড়লরা বাস্তবে কতটুকু করতে পারে বা কীই বা তারা করতে চায়? যৎসামান্য যে সরকারি সুযোগ তা থেকেও তারা বখরা পেতে চায় এবং তাদের টপকে পঞ্চায়েত বা কোন সরকারি দপ্তরে যাওয়াটা তারা আটকে দিয়ে থাকে। গণআন্দোলনের কর্মী-সংগঠকেরা এসবকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন কি করে, তাঁদের তো এইসব দপ্তরে না আছে যাতায়াত না আছে বিষয়গুলো সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য। আমাদের তাই মাটিতে কান পাততে হবে। প্রাথমিক তথ্য জনগণের কাছেই পাওয়া যায়। প্রাথমিক এই তথ্যগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভালভাবে জেনে যাচাই করে নিতে হবে। কোন ভাতা কিম্বা আর্থিক অনুদান অথবা কোন প্রকল্পের উপভোক্তার (বেনিফিসিয়ারি) ক্ষেত্রে যখন সরকার কোটা বেঁধে দেয় তখন প্রথম কাজ হবে জনগণের সাথে আলোচনা করে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিটিকে প্রাপক হিসেবে বেছে নেওয়া। সাথে সাথে কোটা বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি এবং কোটা প্রথা তুলে দেওয়ার জন্য প্রচারকে জোরদার করতে হবে। আসল কথা হল সরকারি সংস্থার কর্মসূচী সম্পর্কে মোহ দূর করা এবং এগুলোর প্রকৃত স্বরূপ মানুষের কাছে উন্মোচিত করে দেওয়া। এক্ষেত্রে একটা-দুটো দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে।

একটি গরিব পরিবারে বিধবা মা ও তার ছেলে—দুজনেরই বি পি এল রেশন কার্ড রয়েছে। রেশন কার্ড করানোর সময় ছেলেটি ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক। বি পি এলে প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য সপ্তাহে বরাদ্দ এক কেজি আড়াইশ গ্রাম চাল, অপ্রাপ্ত বয়স্কের জন্য বরাদ্দ ৫০০ গ্রাম। ঐ পরিবারটিকে বরাদ্দ এক কেজি সাড়ে সাতশ চালের বদলে দেওয়া হয় দেড় কেজি চাল। এই বঞ্চনাটা বড় ব্যাপার নয়। বড় ব্যাপার হল ছেলেটি এখন সাবালক হয়েছে কিন্তু তার জন্য বরাদ্দ চাল ৫০০ গ্রাম থেকে বাড়িয়ে এক কেজি আড়াই শ গ্রাম করা হচ্ছে না। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে ছেলেটির কার্ড বদলে প্রাপ্ত বয়স্কের কার্ড করে দেওয়া যায় কিন্তু বরাদ্দ আর বাড়ানো যাবে না। সরকারি এই ফক্কিবাজির বিরুদ্ধে লড়া হবে কি না?

স্কুল-কলেজে গরিব ছাত্রছাত্রীদের (এস সি, এস টি) স্টাইপেণ্ডের ক্ষেত্রেও বরাদ্দ অর্থ পেতে নানা ঝঞ্ঝাট। এগুলো উন্মোচিত করার সঙ্গে সঙ্গে এস সি/এস টি সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে যে কারচুপি চলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালালে গরিব ঘরের তরুণ প্রজন্মকে সংগঠনমুখী করে তোলা যেতে পারে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

- মুকুল কুমার

... ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

তিনের পাতার পর

শ্রমিক নিয়োগ করে এসেছে।

বর্তমানে মুনাফার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করতে কোম্পানী মালিক অজুহাত দেখাচ্ছে ম্যান ও মেগাওয়াটের মধ্যেকার ভারসাম্যের ব্যাপারে ম্যানপাওয়ার বেশী থেকে যাচ্ছে,ফলে কোম্পানীর লোকসান হচ্ছে। এই ছুতোয় কর্তৃপক্ষ গত ১৭ নভেম্বর নামগোত্রহীন একটা নোটিশ জারি করেছে। ঐ নোটিশে বলা হয়েছে, যে শ্রমিকেরা বজবজ জেনারেটিং স্টেশনে তিন বছর কাজ করেছেন তারা ১৭ থেকে ২৬ নভেম্বরের মধ্যে ভি এস এস স্কীমে স্বাক্ষর করলে তাদেরকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হবে। এভাবে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের নয়া পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। সি ই এস সি কর্তৃপক্ষ সরাসরি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের দায়িত্ব স্বীকার করতে না চেয়ে কনট্রাক্টারদের বলে দিয়েছে শ্রমিক ছাঁটাই করতে হবে। নাহলে কন্ট্রাক্ট থাকবে না। কন্ট্রাক্টাররাও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত নামগোত্রহীন নোটিশ হাতে শ্রমিকদের হুমকি দিতে শুরু করে—'সময়ের মধ্যে স্বাক্ষর করে টাকা নিয়ে নাও, নইলে কাজ এবং টাকা দুটোই হাতছাড়া হবে'। কন্ট্রাক্টাররা আতঙ্ক ছড়িয়ে শ্রমিকদের মুচলেকা দিতে বাধ্য করতে থাকে।

এই খবর পেয়ে স্থানীয় সি পি আই (এম এল) সংগঠনের পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। কমরেড সুদেশ মন্ডলের সহযোগিতায় পার্টির বজবজ শহর লোকাল কমিটি সম্পাদক দেবাশীষ মিত্র সহ রঞ্জন ঘোষ, লক্ষী অধিকারি, সত্যনারায়ণ শা, শংকর পাড়ুই ইত্যাদি কমরেডরা কারখানা চত্বরে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পোস্টারিং করেন। ২৭ নভেম্বর সকালে জেনারেটিং স্টেশনের গেটে বিক্ষোভ সভা করা হয়, বক্তব্য রাখেন এ আই সি সি টি ইউ রাজ্য সভাপতি অতনু চক্রবর্তী, রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কিশোর সরকার ও সুদেশ মন্ডল। আবার বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত পর্যন্ত কারখানা গেট সংলগ্ন পূজালী বাজারে প্রতিবাদ সভা করা হয়। ঐ সভা থেকে শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান রাখা হয়, নামগোত্রহীন কালা সার্কুলার ছিঁড়ে ফেলুন, পুড়িয়ে দিন! ভি এস এস নেবেন না! সি ই এস সি-র শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কালা সার্কুলারের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিক এক হোন!

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
হিন্দি কেন্দ্রীয় মুখপত্র (সাপ্তাহিক)
লোকযুদ্ধ
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ঃ ২০০ টাকা

''আজকের দেশব্রতী''
বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হবে
কলকাতা বইমেলার সময়

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ৩ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com